

রসায়নের ভেলকি

পার্থসারথি চক্রবর্তী

রসায়নের ভেল্‌কি

রসায়নের ভেল্‌কি

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

প্রথম সংস্করণ মে ১৯৭৫ অষ্টম মুদ্রণ জুন ১৯৮৭

প্রচ্ছদ মদন সরকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৫·০০

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা
শ্রদ্ধেয় শ্রীনিশীথরঞ্জন কর মহাশয়ের করকমলে

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শিলং-এর সেই হলুদ বাড়ীটা

আমরা যখন শিলং-এ ছিলাম তখন ইস্কুলে যাওয়ার পথে একটা বাড়ী পড়তো। বাড়ীটা দেখতে ভারী সুন্দর, হলুদ রংয়ের, আর তার বাগানে অনেক রকম ফুলগাছ ছিল। ঐ বাড়ীতেই আমি প্রথম ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা ফুল দেখেছিলাম। বাড়ীর ছোট্ট পাঁচিলের গায়েই ছিল ফুলগাছটা। অনেকদিন থেকে ভাবতাম একটা ফুল কি করে নেওয়া যায়। একদিন ইস্কুল থেকে ফেরার পথে পাঁচিলে উঠে একটা ফুল সবে ছিঁড়েছি, এমন সময় কে যেন বলে উঠল—ফুল ছিঁড়তে নেই বাবা। আমি এদিক ওদিক চাইলাম—কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আর একটা মস্তবড় ফুল হাতের খুব কাছেই ছিল। ডালসুদ্ধ ফুলটা ছিঁড়েছি এমন সময় আবার শুনলাম—ফুল ছিঁড়তে নেই বাবা।

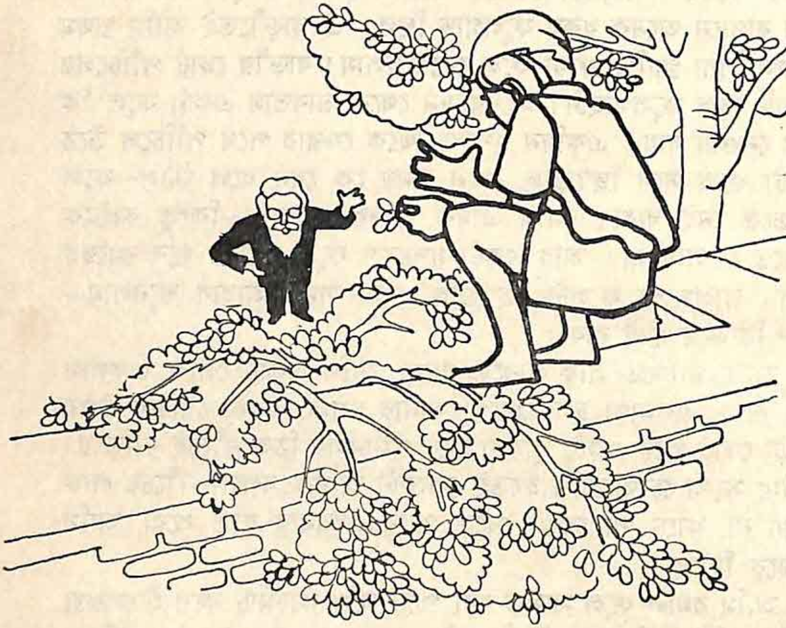
আমি মাটিতে লাফ মারতে যাবো, দেখি একটা লোক, একগাল তার দাড়ি, একমাথা চুল, চোখে সোনার চশমা, একটা গেঞ্জির উপর ছেঁড়া কোট পরে একটু কুঁজো হয়ে পাঁচিলের ঠিক নীচেই দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা আমার বলল—নীচেয় লাফ দিয়ো না, কাচে পা কেটে যেতে পারে। আমার হাত ধরো, আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

আমি বমাল ফুল সমেত ধরা পড়ে মুখ কাঁচুমাচু করে ইতস্ততঃ করছি, হঠাৎ সেই লোকটা নিজেই আমার হাত দুটো ধরে নামিয়ে দিল।

আমার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটা নিশ্চয়ই এবার বকাবকি করবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, লোকটা আমায় বকুনি তো দিলই না বরং আস্তে আস্তে আমায় জিজ্ঞেস করল—তুমি বুঝি খুব ফুল ভালবাস? এবার আমি একটু সাহস পেলাম। বললাম—হ্যাঁ, ম্যাগ্নোলিয়া আমার খুব ভালো লাগে। লোকটা আমায় বলল—এ ফুল আমার কাছে আরও অনেক আছে। বাড়ীর ভেতরে এস, সব তোমাকে দোব'খন।

আমি লোকটার পিছনে পিছনে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলাম। এতদিন এই বাড়ীর ফুলবাগান পাঁচিল থাকার জন্যে ভালো করে দেখতে পাইনি। এবার দেখলাম। একেবারে ছবির মতন সাজানো। বাগানটার ভেতরটাও বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

বারান্দায় ওঠার একটা সিঁড়িতে সবেমাত্র পা দিয়েছি, হঠাৎ শুনলাম কে যেন বলে উঠল—ফুল ছিঁড়তে নেই বাবা। তাকিয়ে দেখি একটা সাদা রংয়ের কাকাতুয়া বারান্দার পাশে রেলিং-এর উপর



নীচেয় লাফ দিয়ো না—কাচে পা কেটে যেতে পারে। আমার হাত ধরো, আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

বসে আছে। ও হরি, এটাই তবে এর আগে কথা বলছিল। কাকাতুয়াটা বেশ ধবধবে সাদা, ঠোঁটটা টিয়ার মতন বাঁকানো আর বেশ বড়সড়। আমি এতবড় কাকাতুয়া কখনও দেখিনি। বড় পিশেমশাই-এর ওখানে একটা কাকাতুয়া দেখেছিলাম—ডিহিরিতে। কিন্তু সেটা অনেক ছোট —আর এরকম চমৎকার মানুষের মতো কথা বলতে পারতো না।

এবার লোকটা আমায় বারান্দার একেবারে শেষের দিকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটায় বিরাট বড় বড় অয়েল পেণ্টিং করা ছবি টাঙানো। ঘরের ঠিক মাঝখানটায় একটা সুন্দর গোল টেবিল, তার উপরে হাজার রকমের ফুল। একটা লোক, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের, বোধহয় চাকর, বসে বসে মালা গাঁথছিল।

গেঞ্জির উপর ছেঁড়া কোট পরা লোকটা টেবিল থেকে অনেক-গুলো বড় বড় ম্যাগ্নোলিয়া ফুল এনে আমায় দিল। আমি জামার কোঁচড়ে করে আমার আগের ছেঁড়া ফুল দুটো আর এগুলো নিয়ে বাড়ী চলে এলাম।

আমরা যখন কোলকাতায় ছিলাম, তখন মনে আছে একবার পাশের পঞ্চাননবাবুর বাড়ী থেকে একটা লাল জিনিয়া ফুল ছিঁড়ে-ছিলাম বলে তিনি আমায় কেবল মারতে বাকী রেখেছিলেন। তাই শিলং-এর এই সুন্দর পাঁচিল দেওয়া বাড়ীর দাড়িওয়ালা লোকটার ব্যবহারে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। এরপর থেকে প্রায়ই আমি লোকটার কাছে যেতাম।

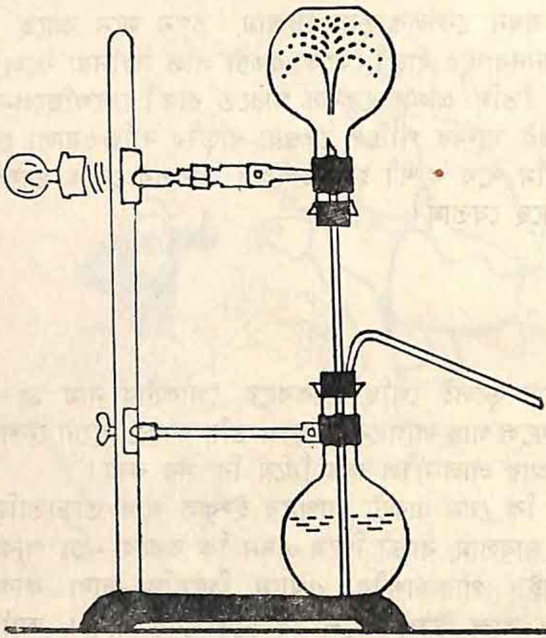
ও, বলতে ভুলেই গেছি একেবারে, লোকটার নাম ডঃ জ্ঞানেশ পাকড়াশী। ফুল গাছ লাগানো ছাড়াও তাঁর আরও দুটো নেশা ছিল। ছবি আঁকা আর লাল-নীল জল নিয়ে কি সব করা।

একদিন কি যেন একটা ব্যাপারে ইস্কুল খুব তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। ভাবলাম, বাড়ী গিয়ে এখন কি করবো—ডঃ পাকড়াশীর ওখানেই যাই। পাকড়াশীর ওখানে গিয়েছি—সাদা কাকাতুয়াটা আমায় দেখে বলে উঠল—ফুল ছিঁড়তে নেই বাবা। আমি মনে মনে ভাবলাম এখন তো আর আমায় ফুল ছিঁড়তে হয় না। তোমার মনিবই ফুল ছিঁড়ে আমায় দেয়।

আমি এঘর ওঘর ডঃ পাকড়াশীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন সময় চাকরটা বলল—বাবু পিছনের দিকের ঘরে আছেন। ওমা, পিছনের দিকে আবার কোন ঘর আছে নাকি? আমি তো দেখিনি। যাই হোক ডঃ পাকড়াশীর পিছনের ঘরে গিয়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম।

ঢুকতেই দরজার উপরে লেখা আছে LABORATORY. আমার বড়দা, ল্যাবরেটরীতে কি সব করে, তার কাছে এই কথাটা অনেকবার

শুনেছি কিন্তু ল্যাবরেটরী কোনদিন দেখিনি। টেবিলে কাচের কতো শিশি বোতল, তাতে আরও কতো কী লেখা, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি অবাক হয়ে এসব দেখছি এমন সময় ডঃ পাকড়াশী এসে আমায় বললেন—একটা মজার জিনিস আজ তোমায় দেখাবো। এই বলে তিনি আমায় বড় টেবিলটার পিছনে নিয়ে গেলেন। দেখলাম —কি মজার কান্ড, একটা কাচের পাত্র থেকে নীল জল উপরের দিকের সরু একটা নল দিয়ে উঠছে আর উপরে রাখা আর একটা কাচের পাত্রের মধ্যে পড়েই লাল হয়ে যাচ্ছে।

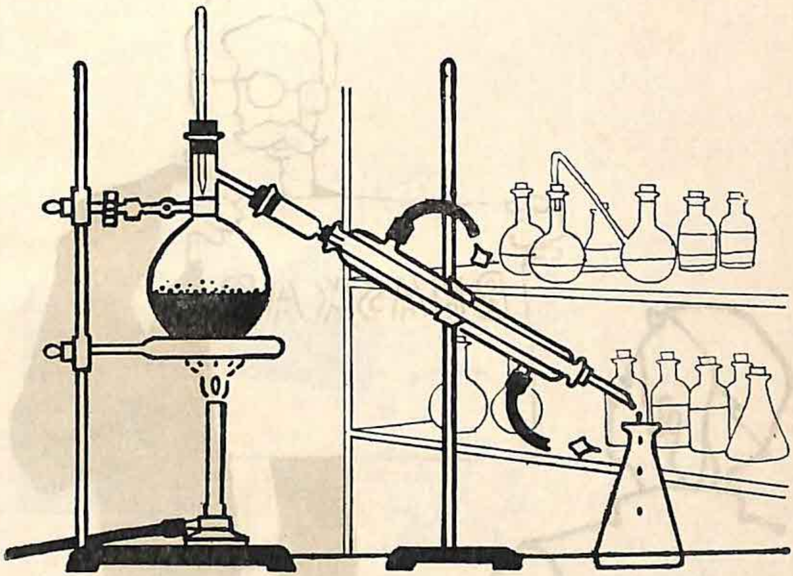


নীল জল উপরের দিকের সরু একটা নল দিয়ে উঠছে আর উপরে রাখা আর একটা কাচের পাত্রের মধ্যে পড়েই লাল হয়ে যাচ্ছে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বললেন—কেমিষ্ট্রি, কেমিষ্ট্রি দিয়ে যে কতো কি করা যায় তা বলে শেষ করা যাবে না। যে মজার ব্যাপারটা তোমায় আমি দেখালাম এটা অ্যামোনিয়ার ফাউনটেন এক্স-পেরিমেণ্ট। বড় হতে হলে আর বিজ্ঞান শিখতে হলে এই কেমিষ্ট্রি ছাড়া গতি নেই।

এমন সময় ল্যাবরেটরীর মধ্য থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে এল—মিষ্টি, গোলাপ ফুলের গন্ধের মতন। দেখি আমার সামনের টেবিলের উপরেই পড়ে রয়েছে একটা শিশি আর তার থেকে এই গন্ধটা বেরোচ্ছে। ডঃ পাকড়াশী বললেন—এটার নাম ফিনাইল এথাইল অ্যালকোহল। এই অ্যালকোহলটার গন্ধ ঠিক গোলাপ ফুলের গন্ধের মতন।

ল্যাবরেটরীর ঠিক পাশে খুব ছোট একটা ঘর। ল্যাবরেটরী ঘর থেকেই দেখতে পেলাম ছোট ঘরটায় একটা বড় কুজোর মতো কাচের পাত্রে গোলাপী রংয়ের জল টগবগ করে ফুটছে আর শোয়ানো



জলকে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করা হচ্ছে।

একটা কাচের নল দিয়ে আর একটা পাত্রে টপটপ করে টলটলে পরিষ্কার জল পড়ছে। গোলাপী রংয়ের জিনিসটা কি বুঝতে পারলাম না, তবে আমাদের দোতলার টবের পর্তুলিকা ফুলের মতো তার রং। ডঃ পাকড়াশী আমায় ছোট্ট ঘরটার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বললেন—এই গোলাপী জিনিসটা হচ্ছে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। এই পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে পিওর ওয়াটার তৈরী হচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে ল্যাবরেটরীর চারদিক দেখছি এমন সময় ডঃ পাকড়াশী বলে উঠলেন—আচ্ছা, তোমার ম্যাজিক দেখতে ইচ্ছে করে? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—ম্যাজিক দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে, আমার ছোটমামা একটা তাসকে টুকরো টুকরো কেটে আবার ঠিক আগের মতো করে দিতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, আমি নিজেও একটা ম্যাজিক জানি—দাঁড় কেটে ছোট করার খেলা, যতবার খুশী দড়িটা আমি কাটি না কেন, কখনও সেটা ছোট হবে না, কিন্তু ডঃ পাকড়াশীকে আমার সে কথা বলতে লজ্জা করল।



কাগজের উপর আগুন হয়ে জ্বলে আমার নামটা ফুটে উঠল।

এরপর একটা অবাক করা ব্যাপার ঘটল। যদিও এসব অনেকদিন আগেকার কথা, তবু এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ডঃ পাকড়াশী ল্যাবরেটরী ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন—ঠিক আছে, তোমায় আমি এখন কতকগুলো কেমিক্যাল ম্যাজিক দেখাচ্ছি। তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে।

আমি একটা বড় টুলের উপর বসলাম। ডঃ পাকড়াশী একটা মোটা সাদা কাগজ নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর তিনি

একটা ছিপি আঁটা কাচের বোতলের মধ্যে একটা তুলি ডুবিয়ে কাগজের উপর কি যেন একটা লিখলেন মনে হলো। আমার সামনে কাগজটা মেলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো লেখা দেখতে পাচ্ছ কিনা বল তো? আমি বললাম, না। কিন্তু কি আশ্চর্য, ডঃ পাকড়াশী ওটা দু'হাতে আমার সামনে কয়েক সেকেন্ড ধরতেই আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম কাগজের উপর আগুন হয়ে জ্বলে আমার নামটা ফুটে উঠেছে।

ডঃ পাকড়াশীই আমায় বললেন, যে জিনিসটার সাহায্যে আমি তুলি দিয়ে কাগজে লিখলাম তা হচ্ছে ফসফরাস আর কার্বন-ডাই-সালফাইডের একটা মিশ্রণ। দু'গ্রাম ফরফরাসকে তার পাঁচগুণ



আমি যে রং বলবো, বার্নারের আগুনে ঠিক সেই রং হবে।

আয়তনের কার্বন-ডাই-সালফাইড দিয়ে মিশ্রণটি আমি তৈরি করেছি। এটা দিয়ে তুমি কাগজে যে কোনও কথা অথবা ছবি আঁকতে পার। প্রথমে দেখা যাবে কাগজে কিছু লেখা নেই—পরে আগুন দিয়ে লেখা অথবা ছবিটা ফুটে উঠলে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। কার্বন-ডাই-সালফাইড খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে উড়ে গেলে কাগজে পড়ে থাকে

শুধু মাত্র ফসফরাস। এই ফসফরাস বাতাসের সংস্পর্শে এলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে। অন্ধকারেই এই খেলাটা জমে ভালো।

আমার এত ভালো লাগছিল যে কি বলি! মন্ত্রমুগ্ধের মতো টুলের উপরে বসে আমি শুধু গেঞ্জির উপর ছেঁড়া কোট পরা দাড়িওয়ালা ডঃ পাকড়াশীর কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম।

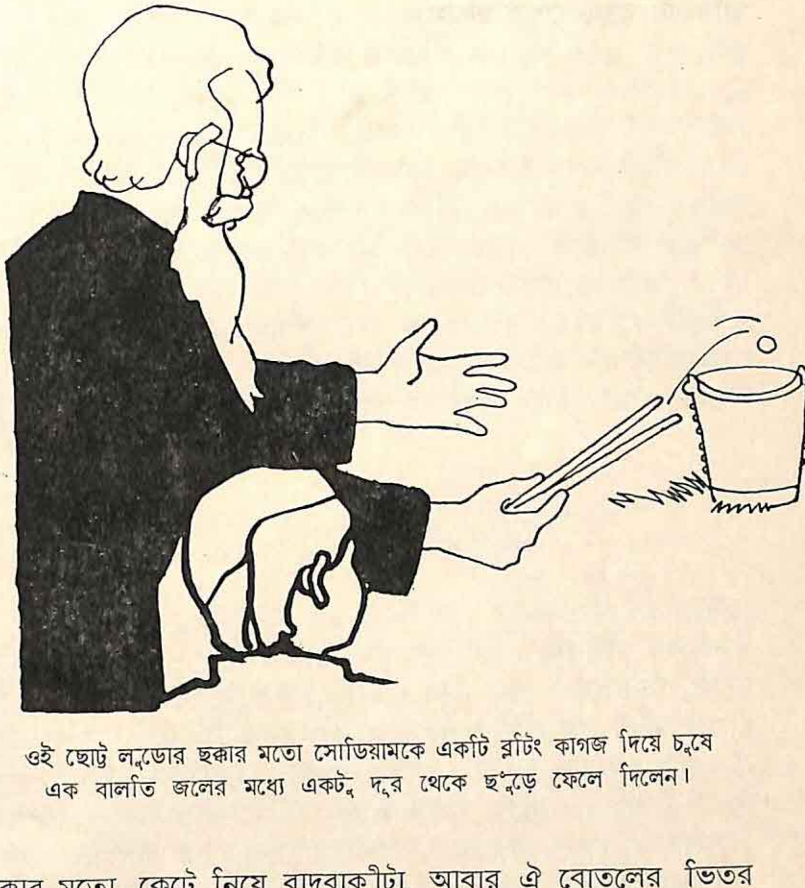
ডঃ পাকড়াশী এবার একটা বার্নার জ্বালালেন। আমি এর আগে বড়দার কাছে বার্নার দেখেছিলাম। আমায় সরু কাচের নলের সাথে আটকানো একটা তার দেখিয়ে তিনি বললেন, এটা প্লাটিনাম তার। আর একটা খুব ছোট কাচের পাত্র দেখিয়ে বললেন, এটার নাম ওয়াচ গ্লাস। এই ওয়াচ গ্লাসে তিনি নিলেন ঘন হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড। চারটে প্লাটিনাম তার ও চারটে ঘন হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড বোঝাই ওয়াচ গ্লাস টেবিলের উপর বার্নারের পাশে পর পর রাখা হলো। এরপর তিনি চার টুকরো কাগজের উপর একরকম সাদা গুঁড়ো নুনের মতন কি যেন একটা জিনিস নিয়ে বললেন—আমি প্রথমে প্লাটিনাম তারটাকে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডে ডুবাবো। তারপর ডুবাবো কাগজে রাখা নুনের মতন দেখতে জিনিসটায়। সবশেষে তারটাকে আবার হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডে ডুবিয়ে বার্নারের আগুনে ধরবো। আমি যে রং হতে বলবো বার্নারের আগুনের রং ঠিক তাই হবে। প্রত্যেকটা প্লাটিনাম তারের জন্য আলাদা আলাদা ওয়াচ গ্লাস ও সাদা গুঁড়ো নেওয়া হলো।

ডঃ পাকড়াশী প্রথমবার বললেন, টকটকে লাল আগুন হবে এবার বার্নারে। আর কি আশ্চর্য, হলোও ঠিক তাই। এরপর বললেন, কাঁচা আপেলের মতো সবুজ রং হবে। ঠিক তাই হলো। তারপর হলো হলুদ ও সবশেষে হালকা গোলাপী।

ডঃ পাকড়াশীর এই খেলা দেখার অনেক অনেক দিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম, কি করে তিনি এটা করেছিলেন। কাগজে করে যে জিনিসগুলো নেওয়া হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে—স্ট্রনসিয়াম কার্বনেট, বেরিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম কার্বনেট। এদের সবাইকে দেখতে প্রায় একই রকম কিন্তু এদের হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডযুক্ত প্লাটিনামের তার বুনসেন বার্নারের আগুনে ধরলে এরা আলাদা আলাদা রংয়ের সৃষ্টি করে।

ডঃ পাকড়াশী আমায় এবার বললেন—এবার তোমায় আমি আজকের শেষ ম্যাজিকের খেলাটা দেখাবো। জলের মধ্যে আমি একটা বোমা ফাটাবো, তুমি ভয় পেয়ো না যেন। অবশ্যি আমি ম্যাজিকটা তোমায় শিখিয়েও দিচ্ছি—খেলা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে।

ডঃ পাকড়াশী একটা বোতল নিয়ে টেবিলে রাখলেন। বোতলের গন্ধ দেখেই আমি বুঝলাম সেটা কেরোসিন তেলের, তবে তার মুখটা সাধারণ বোতলের চেয়ে অনেক বড়। একটা চিমটা দিয়ে তার তলা থেকে একটা সাদা জিনিস বার করলেন, তারপর ছুরি দিয়ে লুডোর



ওই ছোট্ট লুডোর ছক্কার মতো সোডিয়ামকে একটি ব্লটিং কাগজ দিয়ে চুষে এক বালতি জলের মধ্যে একটু দূর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ছক্কার মতো কেটে নিয়ে বাদবাকীটা আবার ঐ বোতলের ভিতর ঢুকিয়ে রাখলেন। বোমার সাইজ দেখে আমার হাসি পেল। ভাবলাম আমি লাঠির সাথে চাবি বেঁধে তার ফুটোর মধ্যে দেশলাই-এর বারুদ দিয়ে কতো বোমা ফাটিয়েছি, ডঃ পাকড়াশীর বোমা কি তার চেয়েও জোরে ফাটবে! ছক্কার মতো জিনিসটা দেখিয়ে তিনি আমায় বললেন —এটা সোডিয়াম ধাতু। সব সময় কেরোসিনের তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

কোনও ধাতুকে ছুরি দিয়ে কাটা যায় বলে আমার ধারণা ছিল না। যাই হোক, ওই ছোট্ট সোডিয়ামকে এরপর তিনি একটা ব্লটিং পেপার দিয়ে চুষে ল্যাবরেটরীর বাইরে রাখা এক বালতি জলের মধ্যে একটু দূর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটার মতো বিকট জোরে শব্দ হলো, আর আমি তো সত্যি কথা বলতে কি, খানিকটা ভয়ও পেয়েছিলাম।

আরও ম্যাজিক

শিলং-এর ডক্টর পাকড়াশীর চেহারা ছিল খুব সুন্দর। প্রায় ছ' ফুট লম্বা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, মুখে একগাল দাড়ি আর ঠিক সাহেবের মতো ফরসা ছিল তাঁর গায়ের রং। কথা বলতেন খুব আস্তে আস্তে, আর কোনও কথা বলার আগে তাঁর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠতো। ছোট ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতেন তিনি খুব। আমি তাঁকে কোনদিন জামা পরতে দেখিনি, সব সময়ে তিনি গেঞ্জির উপর একটা কোট চাপিয়ে থাকতেন। বিয়ে-থাওয়া করেননি, বাড়ীতে তাঁর সংগী ছিল চাকর নটবর, বড় সাদা একটা কাকাতুয়া পাখী, ফুল-বাগান আর পিছনের ল্যাবরেটরী ঘরটা। ল্যাবরেটরীতে ইদানীং তিনি বিটা আয়োনোন নামে একটা জিনিস দিয়ে কি সব করছিলেন। তাই ওঁর ল্যাবরেটরী ঘরে ঢুকলেই আজকাল ভারী সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসতো।

আমি তো ইস্কুল ছুটির পর প্রায়ই ডক্টর পাকড়াশীর ল্যাবরেটরী ঘরে গিয়ে ধরনা দিতাম। ডক্টর পাকড়াশীকে কেমিষ্ট্রির নানারকম ভেল্কি বাজী দেখাতে বললে কখনও তিনি রাগ করতেন না। আমি ল্যাবরেটরী ঘরের সেই লম্বা টুলটার উপর বসতাম আর তিনি আমার সামনের টেবিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক করা যত সব কাণ্ডকারখানা করতেন। লাল, তারপর নীল, সবুজ, হলুদ, গোলাপী কত রকম যে রংয়ের ভেল্কি বাজী চোখের সামনে ভেসে উঠতো তা কি বলবো! আমার বয়স তখন আর কতো—এই দশ-বারো বছর হবে, কিন্তু এখনও মনে পড়লে আমি পরিষ্কার সেই মজার ঘটনাগুলো চোখের সামনে দেখতে পাই।

আমার ছোট বোন অঞ্জুর কাছে আমি ডক্টর পাকড়াশীর গল্প করেছিলাম। অঞ্জু রোজ আমায় বলতো, সেও ম্যাজিক দেখবে। তাই সেদিন ঠিক করলাম অঞ্জু আর আমি দু'জনে কেমিক্যাল ম্যাজিক দেখতে যাবো।

সেদিন দুপুর থেকেই বেশ মেঘ করে এসেছিলো। খানিক বাদে আরম্ভ হলো মুষলধারে বৃষ্টি। বিকেল হয়ে এল, তবু বৃষ্টি ধরে আসার নামগন্ধও নেই। তখন ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা বাজে, বৃষ্টিও ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে কিন্তু একেবারে থামেনি, আমি আর অঞ্জু একটা ছাতার তলায় দু'জনে গুটি গুটি রওনা দিলাম ডক্টর পাকড়াশীর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীর উদ্দেশে।

অঞ্জুও কোনদিন এ বাড়ীটার ভেতর ঢোকেনি। বাড়ীর ফুল-বাগানে সেদিন ফুটেছিল অজস্র গোলাপ, রজনীগন্ধা আর ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা। অঞ্জুরও নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছিল।

আমি জানতাম এসময়ে ডক্টর পাকড়াশী তাঁর পিছনের ল্যাবরেটরী ঘরে থাকেন। তাই অঞ্জুকে নিয়ে সোজা সেখানে উপস্থিত হলাম। ডক্টর পাকড়াশী তখন একটা টেষ্টটিউব হাতে নিয়ে কি সব করছিলেন। আমাদের দেখেই খুব খুশী হয়ে বলে উঠলেন, আরে এসো, এসো। আমি অঞ্জুকে দেখিয়ে বললাম—এ আমার ছোট বোন, ম্যাজিক দেখবে বলে আপনার কাছে এসেছে।

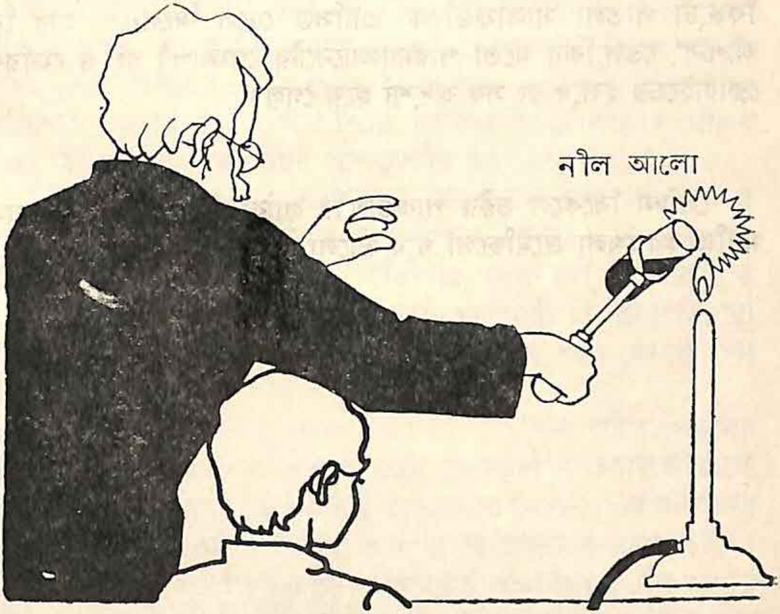
ডক্টর পাকড়াশী টুলের উপর আমাদের দুজনকে বসতে বলে পাশের ছোট ঘরটার মধ্যে চলে গেলেন। ওই ঘরের রেফ্রিজারেটর থেকে দুটো আইসক্রীম বের করে একটা আমাকে আর একটা অঞ্জুকে দিলেন। অঞ্জু আইসক্রীম খেতে খুব ভালবাসে।

আমরা বসে বসে আইসক্রীম খাচ্ছি, দেখি ডক্টর পাকড়াশী একটা টেস্টটিউবের মধ্যে জলের মতো কি একটা নিয়ে নিলেন। অঞ্জুকে বললেন—এই টেষ্টটিউবের মাথায় আমি নীল আগুন জ্বালাবো। অঞ্জু চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগলো ঐ ছোট্ট কাচের টেষ্টটিউবের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে কি করে।

আমি এই ম্যাজিকটা ওঁর কাছে আগেই দেখেছিলাম। টেষ্টটিউবে যে জলের মতন জিনিসটা নেওয়া হয়েছে ওটার নাম ফরমিক এ্যাসিড। ঐ ফরমিক এ্যাসিডের মধ্যে কয়েক ফোঁটা ঘন সালফিউরিক এ্যাসিড মিশিয়ে গরম করে টিউবটার মুখ বুনসেন বার্নারে ধরলেই নীল আগুন জ্বলবে।

ডক্টর পাকড়াশী টেষ্টটিউবের মধ্যে সালফিউরিক এ্যাসিড মিশিয়ে ওটাকে গরম করে আমাদের হাততালি দিতে বললেন। আমরা হাততালি দিলাম, তিনিও ওটাকে গরম করার পর টেষ্টটিউবের মুখটা বার্নারে ধরতেই তার মুখে নীল আলো জ্বলে উঠল। বার্নার থেকে টেষ্টটিউবের মুখটা সরিয়ে আনতেও দেখা গেল, অবাক কাণ্ড—তার মুখে সুন্দর নীল আগুন জ্বলছে!

এর পরের খেলাটা খুব মজার। আমি ডক্টর পাকড়াশীর কাছ থেকে খেলাটা শিখে নিয়েছিলাম। একটা টেষ্টটিউবের মধ্যে কিছুটা বোরাক্স আর ফেনোলপ্‌থ্যালিনের দ্রবণ নিলে সেটা গোলাপী রংয়ের হয়। ডক্টর পাকড়াশী টেষ্টটিউবের গোলাপী রংটা অঞ্জুকে দেখিয়ে বললেন—এই রংটা আমি এক্ষুনি অদৃশ্য করে দিতে পারি। এই বলে তিনি তার মধ্যে অল্প একটু গ্লিসারিন দিয়ে দিলেন। আর কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী রংটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অথচ কি মজা, টেষ্টটিউবটা একটু গরম করতেই সেই অদৃশ্য গোলাপী রং আস্তে আস্তে আবার ফিরে এল। আরও অবাক কান্ড, ঐ টেষ্টটিউবটাকে



টেষ্টটিউবের মুখটা বার্নারে ধরতেই তার মুখে নীল আলো জ্বলে উঠল!

জল দিয়ে ঠান্ডা করতেই গোলাপী রংটা আবার উধাও হয়ে গেল। অঞ্জু তো এই ম্যাজিকটা দেখে বেজায় খুশী। ডক্টর পাকড়াশী কিছু না বলতেই এবার সে হাততালি দিয়ে উঠল।

আমি আমাদের বাড়ীতে কিছুটা বোরাক্স, ফেনোলপ্‌থ্যালিন আর গ্লিসারিন জোগাড় করে মিঠুন, বাবুন, বাপ্পা, লবু-কুশু আর ডিংকুকে এই মজার খেলাটা দেখিয়েছিলাম।

এর পরের খেলাটিও টেষ্টটিউবে দেখিয়েছিলেন ডক্টর পাকড়াশী। একটা টেষ্টটিউবের মধ্যে কিছুটা হালকা পটাসিয়াম পারম্যাঙগানেটের দ্রবণ নেওয়া হল। এই পারম্যাঙগানেটের চেহারা হচ্ছে গোলাপী রংয়ের। আর একটা টেষ্টটিউবের মধ্যে নেওয়া হলো হলুদ রংয়ের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ। ডক্টর পাকড়াশী বললেন—পারম্যাঙগানেটের গোলাপী রং ও ফেরিক ক্লোরাইডের হলুদ রং আমি অদৃশ্য করে দেবো।

আমি কিন্তু এর আগে এ ম্যাজিক দেখিনি। তাই আমিও অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম, কি করে রংগুলো সব উধাও হয়! ডক্টর পাকড়াশী টেষ্টটিউব দুটোর মধ্যে কয়েকটা দস্তার টুকরো ও কিছুটা পাতলা সালফিউরিক এ্যাসিড ঢেলে দিলেন। আর কি আশ্চর্য, ভেল্কির মতো পারম্যাঙগানেটের গোলাপী রং ও ফেরিক ক্লোরাইডের হলুদ রং সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেদিন বিকেলে ডক্টর পাকড়াশীর ল্যাবরেটরী ঘরে কেমিক্যাল ম্যাজিকের খেলা জমেছিলো খুব ভালো।

শনিবার দিন ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরেই শুনলাম বাবা বদলি হয়েছেন কোলকাতায়। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের সবাইকে শিলং ছেড়ে চলে যেতে হবে। কোলকাতা যাবার কথা শুনে মনটা তখন আনন্দে নেচে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু শিলং ছেড়ে যেতে হবে ভেবে মনটা দমে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, এই ক'বছরে শিলং তার নয়নাভিরাম রূপ নিয়ে আমার শৈশব আর কৈশোরের সন্ধিক্ষণে এক স্বপ্নের জগত সৃষ্টি করেছিল। শিলং-এর আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের স্তূপ, নির্জন পাইন বনের স্নিগ্ধ ছায়া, দিশপুরের কাছের সবুজ শৈলশ্রেণী—খাসি আর জয়ন্তিয়া পাহাড় যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর হ্যাপি ভ্যালি—যেখান থেকে গোটা শিলং শহরটা ছবির মতো দেখায়, এদের ছেড়ে যেতে হবে ভেবে আমার কান্না পাচ্ছিল। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল শিলং-এর সেই হলুদ বাড়ীর গেঞ্জির উপর ছেঁড়া কোট পরা ডক্টর পাকড়াশীর কথা মনে করে।

শিলং থেকে চলে আসার আগের দিন আমি আর অঞ্জু হলুদ বাড়ীর ডক্টর পাকড়াশীর সাথে দেখা করতে গেলাম। তখন সকাল আটটা কি ন-টা হবে, আকাশ পরিষ্কার, বেশ ঝল্‌মলে রোদ্দুর উঠেছে। আমি বাগানের ধবধবে সাদা ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা ফুলগুলো দেখছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম, আর কোনও দিন হয়তো এই বাড়ীতে আমার আর আসা হবে না।

আমাদের দেখে নটবর বলল, বাবু এই কিছুক্ষণ আগে পিছনের দিকের ঘরে গিয়েছেন। আমরা ডক্টর পাকড়াশীর ল্যাবরেটরীতে ঢুকতেই তিনি আমায় একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিলেন। ওঁর টেবিলের উপর ছিল একটা কাচের বীকার, আর তা প্রায় অর্ধেক জলে ভর্তি। বীকারের জলের একেবারে নীচে একটা ছোট্ট আল্‌পিন। উনি আমায় বললেন, ভাস্কর, জলে হাত না দিয়ে এবং বীকার থেকে একটুও জল না সরিয়ে তুমি কি ঐ আল্‌পিনটা উপরে নিয়ে আসতে পারো?

আমি কি করবো ভাবছি, এমন সময় অঞ্জু পাশের ডেস্ক থেকে একটা ছোট্ট চুম্বক বীকারের বাইরের দিকে যেখানটায় জলের তলার আল্‌পিনটা দেখা যায়, সেখানে লাগিয়ে ওটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে ওঠাতে লাগল। আর কি আশ্চর্য, ওই ছোট্ট আল্‌পিনটা জলের তলা থেকে তড়াক করে লাফ মেরে মেরে একেবারে ম্যাজিকের মতো উপরে উঠে এসে ঐ চুম্বকের গায়ে আটকে গেল।

ডক্টর পাকড়াশী এবার সাবাস্‌ বলে অঞ্জুর পিঠ চাপড়িয়ে ওকে

তারিফ করলেন। চুম্বক লোহাকে টানে, এই সামান্য জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অঞ্জু আমাদের সবাইকে এক মজার ভেল্‌কি দেখিয়ে দিল।

ডক্টর পাকড়াশী অঞ্জুকে বললেন, একটা আস্ত চক্ অথবা পেন্সিলকে ভেঙে দু' টুকরো করে আবার কি তাদের তুমি জোড়া লাগাতে পারো? অঞ্জু ঘাড় নেড়ে জানাল, না, ওটা করা যাবে না, কারণ তাদের ভেঙে যাওয়া খন্ড দুটো পরস্পরকে আকর্ষণ করে ধরে রাখতে পারে না।

ডক্টর পাকড়াশী বললেন, কিন্তু যদি দুটো সীসার চোঙকে মুখোমুখি চেপে ধরা যায় তবে এক অবাক কান্ড হবে। চোঙ দুটো এত জোরে আটকে যাবে যে তাদের টেনে আলাদ করতে গেলে তোমাকে বেশ মেহনত করতে হবে। একট লোহার ছুরি দিয়ে আটকে যাওয়া চোঙের মাঝখানে খুব জোরে চাপ দিলে তবেই তাদের আলাদা করা যাবে।—ব্যাপারটা খুব মজার নয় কি?

তুমি সীসার চোঙের এই ভেল্‌কি বাজী দেখিয়ে সবাইকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। এরপর ডক্টর পাকড়াশী সীসার চোঙের মুখ দুটো বেশ ভালো করে কেটে চেঁছে পরিষ্কার ও মসৃণ করে নিয়ে তাদের মুখোমুখি চেপে ধরলেন। আর কি মজা, সঙেগ সঙেগ চোঙ দুটো একেবারে আটকে গেল। এবার ওটাকে তিনি একটা রিং স্ট্যান্ডের সাথে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দিলেন। চোঙের তলার আংটার সাথে একশো গ্রাম ওজন, তার নীচে একশো গ্রাম ওজন—এই ভাবে আরও ওজন ঝুলিয়ে দিয়ে দেখা গেল চোঙ দুটো প্রায় এক কিলোগ্রাম ওজনকে ধরে রাখতে পারছে!

ডক্টর পাকড়াশী আরও বললেন—সীসা হচ্ছে খুব নরম ধাতু। সীসার চোঙ দু'টির অণুদের মধ্যেকার আকর্ষণ শক্তি এত বেশি যে তাদের খুব কাছাকাছি আনতে পারলে এই শক্তির দরুন তারা আটকে যায়। লোহা, সোনা অথবা তামার মতো শক্ত ধাতুর বেলায় তাদের অণুরা এত কাছাকাছি আসতে পারে না। কাজেই দু' খন্ড লোহা অথবা সোনাকে খুব কাছে এনে আটকে দেওয়া যায় না।

ডক্টর পাকড়াশী এবার একটা মোটা কাগজের উপর কিছু লোহার গুঁড়ো ও গন্ধকের গুঁড়ো একসাথে মিশিয়ে অঞ্জুকে বললেন—এদের আলাদা করতে পারো?

অঞ্জু এবারও ঠিক আগের মতো চুম্বকটা এনে ঐ মিশ্রণের উপর ধরতেই চুম্বকের গায়ে লোহার গুঁড়োগুলো আটকে গেল। গন্ধক ও লোহার গুঁড়ো এইভাবে চুম্বকের সাহায্যে বেশ সহজেই আলাদা করা যায়। আলাদা করার পর লোহার গুঁড়ো আর গন্ধকের নিজ নিজ

ধর্মের কোনও পরিবর্তন হয় না।

এবার ডক্টর পাকড়াশী একটা মোটা কাচের টেষ্টটিউবে নির্দিষ্ট ওজনের লোহার গুঁড়ো (সাত ভাগ) ও গন্ধকের গুঁড়ো (চার ভাগ) নিয়ে তারপর ঐ টিউবটার মুখ একটা টেষ্টটিউব হোল্ডারের সাথে আটকে নিলেন। ঐ মিশ্রণকে একটা স্পিরিট ল্যাম্পে উত্তপ্ত করার পর দেখা গেল, তার উপরের অংশ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। টিউবটাকে ভেঙে ফেলে সবশেষে চিমটার সাহায্যে কাচের টুকরোগুলিকে সরিয়ে টেষ্টটিউবের অল্প পাউডার জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো।

লোহা ও গন্ধকের মিশ্রণে তাপ প্রয়োগ করার ফলে তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং সেই সঙ্গে প্রচুর তাপের উদ্ভব হয়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লোহার গুঁড়ো ও গন্ধক তাদের নিজের নিজের ধর্ম হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ এক নতুন পদার্থের সৃষ্টি করে, যার নাম—আয়রণ সালফাইড। ডক্টর পাকড়াশী ঐ আয়রন সালফাইডের উপর চুম্বক ধরলেন, কিন্তু অবাক কাণ্ড, চুম্বক এবার আর ওকে টানতে পারল না।

আমি আর অঞ্জু ডক্টর পাকড়াশীর এই সমস্ত অবাক করা কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম, আর তাঁর উপর শ্রদ্ধায় আর ভালোবাসায় মনটা ভরে উঠছিল। আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল, ইচ্ছে করছিল, ওঁকে বলি—আমরা সবাই কাল শিলং ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর কোনদিনও হয়তো এই ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা ফুলের বাগানে আসব না, কিন্তু কেন জানি না, সে কথা আমার মুখ ফুটে বের হলো না।

বাড়ী ফিরে আসবার পথে অঞ্জু আমার জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা দাদা, ডক্টর পাকড়াশী কি করে এসব অবাক করা কাণ্ডকারখানা দেখান?

আমি বললাম—ডক্টর পাকড়াশী যেসব ভেল্‌কি বাজী দেখান সেগুলো ওঁর হাতের কায়দা অথবা যন্ত্রপাতির কৌশল নয়। এইসব ম্যাজিকের পিছনের মূল ভূমিকা হচ্ছে রসায়নের। টেষ্টটিউবের মাথায় নীল আলো জ্বলল কেন বলতে পারিস?

অঞ্জু বলল—তা তো জানি না।

আমি বললাম—ঘন সালফিউরিক এ্যাসিড ফরমিক এ্যাসিড থেকে জল শুষে নিয়ে। এর ফলে কার্বন-মনো-অক্সাইড নামে একটা গ্যাস টেষ্টটিউবের মাথা দিয়ে বেরুতে থাকে। ঐ গ্যাসে আগুন লাগলেই সেটা নীল হয়ে জ্বলতে শুরু করে।

পারম্যাঙ্গানেটের গোলাপী আর ফেরিক ক্লোরাইডের হলুদ রং দস্তা আর সালফিউরিক এ্যাসিড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করে উধাও হয়ে গেল সেদিন জানতে পারিনি। তার অনেকদিন পরে জেনেছিলাম—দস্তা আর সালফিউরিক এ্যাসিড বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী হয়। এই হাইড্রোজেন গ্যাস জায়মান অবস্থায় থাকে বলে এর জোর খুব বেশি। তাই এটা সঙ্গে সঙ্গে তরল পদার্থের গোলাপী আর হলুদ রং উধাও করে দিতে পারে।

পরে আমি আরও অনেক ভেল্‌কি বাজী ডক্টর পাকড়াশীর কাছ থেকে শিখেছিলাম। আর এগুলো দেখিয়ে আমি বন্ধুদের সব তাক্ লাগিয়ে দিতাম। ওদের মজা লাগতো নিশ্চয়ই, তবে আমার আনন্দ হতো আরও বেশি। বন্ধুরা আমার নাম দিয়েছিলো ম্যাজিসিয়ান। আমি যেসব খেলা ডক্টর পাকড়াশীর কাছ থেকে শিখেছিলাম তার কিছু এখানে তোমাদের কাছে বলছি। তবে এইসব মজার খেলা দেখাবার সময় খুব সাবধান। কারণ এতে যে সমস্ত রাসায়নিক জিনিস ব্যবহার করতে হয় তার অনেকগুলিই আগুনের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণের সৃষ্টি করতে পারে। দরকার হলে এজন্য তোমরা বড়দের পরামর্শও নিতে পারো।

দর্শকদের কাছে কোন খেলা দেখানোর আগের কাজ হচ্ছে খেলা দেখবার একটা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই পরিবেশ তোমার খেলার মান আরও বাড়িয়ে দেবে। ম্যাজিকের খেলা দেখে লোকে যেমন আনন্দ পায় ঠিক তেমনি আনন্দ পায় খেলা দেখানোর কায়দাতেও।

কায়দা করে গল্প বলে, আগে থেকে আঁটঘাট বেঁধে ম্যাজিক দেখালে লোকে অবাকও হবে, সাথে সাথে আনন্দ পাবে আরও বেশি। এটা অবশ্য চট্ করে আয়ত্ত করা যায় না, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করলেই তবে রপ্ত হওয়া যায়। যেমন ধর তুমি একটা জ্বলন্ত মোমবাতি গিলে খাবে—এই খেলাটা দেখাতে চাও। খেলা দেখাবার আগে তুমি গল্প শুরু করলে—"লেডিজ এ্যান্ড জেণ্টল্‌মেন, একজন কেমিষ্ট হিসাবে আমি আপনাদের কাছে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক কতকগুলো অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা শোনাতে চাই। একজন অবিষ্কারক, আমার বিশেষ বন্ধু এবং তিনি গত সপ্তাহে আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি আমায় বললেন, আফ্রিকার বিশাল অরণ্যের মধ্যে তিনি একবার হারিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে একমাসেরও বেশি তিনি শুধু মাত্র মোমবাতি খেয়ে বেঁচেছিলেন। রাত্রে তিনি এর সাহায্যে আলো জ্বালাতেন আর দিনে এই খেয়ে বেঁচে থাকতেন। এটা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে—কিন্তু "এই দেখুন" (এবার তুমি জ্বলন্ত মোমবাতিটা কায়দা করে ফুঁ দিয়ে নির্ভিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিলে)।

দর্শকরা এতে খুব মজা পাবেন। অথবা "কৃত্রিম সোনা" এই খেলা দেখাতে দেখাতে তুমি একটা গল্প ফেঁদে বসলেঃ

আমেরিকায় আমার বাবার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম বিল জোন্‌স। তিনি হলেন পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ্যাটমিক সায়েণ্টিষ্ট। অবসর সময়ে তিনি এমন একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতেন যেটা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। আপনারা সকলেই পরশমণির গল্প শুনেছেন। যেটা ছোঁয়ালেই লোহাও সোনা হয়ে যায়। বিল জোন্‌স তাঁর এক্সপেরিমেণ্টের সাহায্যে এই রকম পরশমণির খোঁজ পেয়েছিলেন। আপনারা শুনে অবাক হবেন, তাঁর পরশমণি ছিল কিছু ভদ্রমহিলা। অর্থাৎ এই ভদ্রমহিলাদের গায়ে স্পর্শ করা মাত্রই তিনি সোনা তৈরি করতে পারতেন। আমি নিজেকে একজন ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারি, কারণ এই এক্সপেরিমেণ্টটা তিনি আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এর গোপন কথা লুকিয়ে আছে এই দুটো বীকারের (বীকার দুটি তুলে তুমি দর্শকদের দেখালে এবং স্টেজের মধ্যে নেমে পড়লে)।

এরপর তুমি একটা বীকারের তরল পদার্থটা অন্য বীকারে ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলার মাথায় দ্বিতীয় বীকারটা ছোঁয়াও। সেটা সাথে সাথে কৃত্রিম সোনার রংয়ের মতো হয়ে যাবে।

যেসব জায়গায় জল দিয়ে ম্যাজিক দেখাবে সেখানে জলের মধ্যে

নানারকম রং দিয়ে সেটাকে রঙগীন করে নিতে পারো। আগুন জ্বলে ওঠে এমন কোন খেলা দেখানোর সময় ঘরটাকে অন্ধকার করে নিতে পারলে ভালো হয়। দর্শকরাও যেন এই সময় তোমার খেলা দেখানোর টেবিলের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকেন।

রসায়নের এই সব মজার ভেল্‌কি বাজী দেখাতে গেলে তোমার ধৈর্য চাই। প্রথমবার হয়তো কোন কারণে তোমার এক্সপেরিমেণ্ট ফলদায়ক নাও হতে পারে। তাই বলে নিরুৎসাহ হলে চলবে না। আবার চেষ্টা কর—দেখবে চমৎকার হয়েছে, আর দর্শকরাও খুব আনন্দ পেয়েছেন।

চিনির ঢেলায় আগুন

দর্শকদের তুমি ছোট্ট এই খেলাটা দেখিয়ে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। তুমি স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বললে—এই এক ঢেলা চিনিতে যদি কেউ আগুন ধরিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমি তাকে পুরস্কৃত করবো। দু'একজন হয়তো এগিয়ে এসে আগুন ধরাতে চেষ্টা করবে দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে, কিন্তু কেউই পারবে না। তুমি যখন তাদের কাছ থেকে চিনির ঢেলাটা চেয়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবে—তখন সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। অতি সাধারণ এই খেলাটা, এতে যন্ত্রপাতিরও বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই। এটা দেখাতে হলে তোমার চাই—



সুগার কিউব

এক ঢেলা সুগার কিউব, একটা দেশলাইয়ের বাক্স এবং সিগারেটের ছাই।

দর্শকদের কাছ থেকে সুগার কিউবটা নিয়ে নেবার পর আগে থেকে তোমার টেবিলের একপাশে রাখা অল্প সিগারেটের ছাইয়ের সাথে ভালো করে ঘষে নাও। চিনি যেখানে ছাইয়ের সঙ্গে ভালো ভাবে মিশে আছে এমন জায়গায় এবার দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে দেখবে যে, ঢেলাটা জ্বলতে শুরু করেছে।

কেন এমন হয়?

সিগারেটের ছাই এখানে অনুঘটক (catalyst) হিসাবে কাজ করার ফলেই চিনির ঢেলাটা (সুগার কিউব) জ্বলতে থাকে।

সেবার পূজার ছুটিতে আমরা সবাই দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছিলাম পম্পাস টাউনে। রোজ বেড়িয়ে আসার পর বিকেলে আমাদের সান্ধ্য মজলিশ বসত। কোনদিন হতো রবিঠাকুরের গান, কোনদিন বা কবিতা আবৃত্তি করতো কেউ, আবার কোনদিন ডিংকুর মামা সোমনাথ আমাদের সবাইকে রসায়নের ভেল্কি বাজী দেখিয়ে চমক লাগিয়ে দিত।

সোমনাথ প্রথম দিন আমাদের যে খেলাটা দেখিয়েছিল সেটা এখন বলছি। এই মজার ভেল্কি বাজী দেখাতে আমাদের দরকার হবে—

অল্প কিছু পটাসিয়াম ক্লোরেট, একটা লোহার রড, দু' গ্রাম হলুদ ফসফরাস, দশ সিসি কার্বন-ডাই-সালফাইড এবং রিং স্ট্যান্ড।



লোহার রড দিয়ে পটাসিয়াম ক্লোরেট ট্যাবলেটকে ছোঁয়া মাত্র বোমা ফাটার মতো বিরাট জোরে শব্দ হবে।

এই খেলা দেখানোর আগে হলুদ ফসফরাসকে জলের নীচে রাখা বোতলের মধ্যে ছুরি দিয়ে খুব ছোট ছোট করে কাটতে হবে। এরপর একটা চিমটা দিয়ে ফরফরাসের টুকরোগুলো জলের নীচ

থেকে তুলে একটা ছোট কাচের ছিপিওয়ালা বোতলে (যার মধ্যে আগে থেকে দশ সিসি কার্বন-ডাই-সালফাইডের দ্রবণ রাখা হয়েছে) ডুবাও। ফসফরাস কার্বন-ডাই-সালফাইডের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। ফস-ফরাসের সব টুকরো বোতলে ফেলা হয়ে গেলে সংগে সংগে তার মুখটা ছিপি দিয়ে এঁটে দিতে হবে। খুব সাবধানে এই কাজ করবে, কেননা ফসফরাস ও কার্বন-ডাই-সালফাইডের এই মিশ্রণ অতিশয় দাহ্যবস্তু। এর মাত্র একটা ফোঁটাও দপ্‌ করে জ্বলে উঠতে পারে। শুধু তাই নয়, এই দ্রবণ বিষাক্তও খুব। শরীরের কোনও অংশে যেন এই দ্রবণ না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

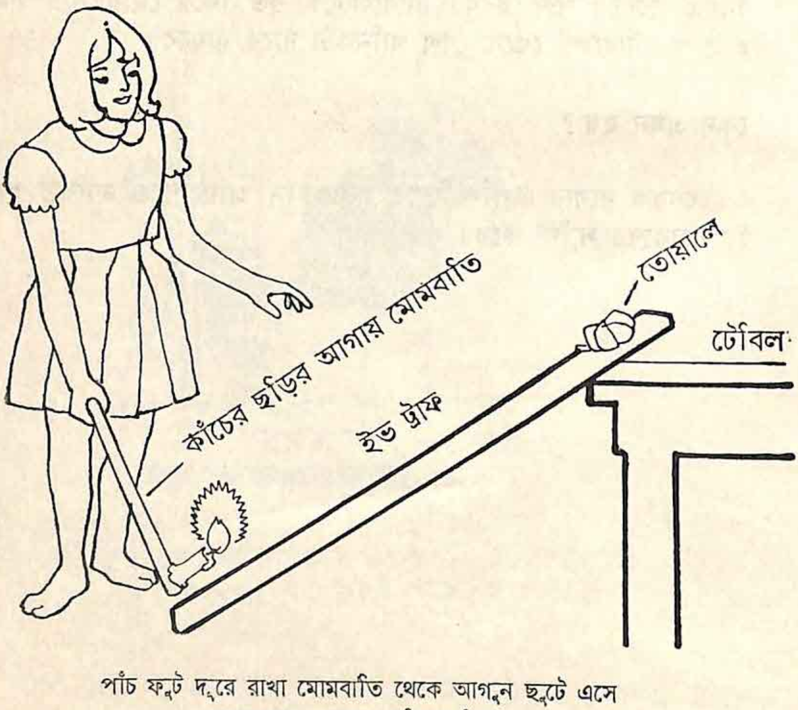
এইবার একটা রিং স্ট্যাণ্ডের পাটাতনে পাঁচ গ্রেন পটাসিয়াম ক্লোরেট ট্যাবলেট রেখে তার উপর কয়েক ফোঁটা ফসফরাস কার্বন-ডাই-সালফাইডের মিশ্রণ ঢাল। প্রায় মিনিট পনের বাদে কার্বন-ডাই-সালফাইড একেবারে উবে যাবে। এইবার একটা বড় লোহার রড দিয়ে পটাসিয়াম ক্লোরেট ট্যাবলেটকে ছোঁয়া মাত্র বোমা ফাটার মতো বিরাট জোরে শব্দ হবে। ট্যাবলেটকে রড দিয়ে ছোঁয়ানোর সময় হাত-পা ট্যাবলেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাখবে।

কেন এমন হয়?

জারক দ্রব্যের উপস্থিতিতে ফসফরাস অতি দ্রুত জারিত হয়ে বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে।

তোমরা বোধ হয় অবাক হয়ে ভাবছো, আগুন নিয়ে খেলা, কি সাংঘাতিক ব্যাপার,—আগুন নিয়ে কি কোন সুস্থ মানুষ খেলা করতে পারে? আরে না, না, ভয় পেয়ো না—এই আগুনের ছোট্ট মজার খেলাটা দেখিয়ে তোমরা সবাইকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। খুব বেশি জিনিসপত্তরের দরকার হবে না এই খেলা দেখাতে। এই ভেল্কি বাজী দেখাতে আমাদের চাই—

পঁচিশ সিসি ইথার, মোমবাতি, তোয়ালে, এক মিটার লম্বা একটা কাচের ছড়ি, পাঁচ ফুট লম্বা ইভ্ ট্রাফ্ (Eaves trough)। ইভ্ ট্রাফ্ পাওয়া না গেলে পাঁচ ফুট লম্বা লোহার অথবা এ্যালু-মিনিয়মের পাত হলেও কাজ চলবে।



পাঁচ ফুট দূরে রাখা মোমবাতি থেকে আগুন ছুটে এসে তোয়ালেতে আগুন ধরিয়ে দিল।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনি কোনাকুনি করে ইভ্ ট্রাফ্ অথবা লোহার পাতটা টেবিলের সঙ্গে রাখ। এবার ট্রাফের মাথায় ছোট একটা তোয়ালে রেখে তার মধ্যে পঁচিশ সিসি ইথার ঢাল। এখন একটা এক মিটার লম্বা কাচের ছড়ির মাথায় মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটা আস্তে আস্তে ট্রাফের তলায় এগিয়ে আনলে একটা আগুনের শিখা ছুটে এসে তোয়ালেতে আগুন ধরিয়ে দেবে। তুমি হাতের কাছে রাখা আর একটা বড় তোয়ালে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছোট তোয়ালেটাকে বেশ ভালো করে চেপে ধরে তার আগুনটা নিভিয়ে দেবে। প্রায় পাঁচ ফুট দূরে রাখা মোমবাতি থেকে আগুন ছুটে এসে ছোট তোয়ালেতে আগুন ধরিয়ে দিতে দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে।

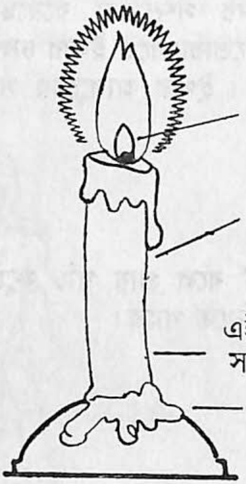
এই খেলা দেখাতেও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে—তাই প্রথম থেকেই খুব সাবধান হবে। ছোট তোয়ালেতে ইথার ঢালার সময় তার ধারেকাছে যেন আগুন না থাকে। ইথার আগুনের সংস্পর্শে এলে খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে।

কেন এমন হয়?

ইথার অতিরিক্ত দাহ্য পদার্থ বলে প্রায় পাঁচ ফুট দূরে রাখা মোমবাতি থেকেও আগুন টেনে নিতে পারে।

সুকুমার রায়ের মজার কবিতা ‘খাই খাই’ তোমরা সকলেই নিশ্চয় পড়েছ। কবি যত রাজ্যের আজব খাওয়ার ভোজ দিয়েছিলেন পাঠক-দের। আমাদের এই ভেল্‌কি বাজীও সেই রকম এক তাজ্জব ব্যাপার। এই খেলাতে তুমি আস্ত একটা মোমবাতি গিলে ফেলে সকলের চোখ একেবারে ছানাবড়া করে দিতে পারো। এটা দেখাতে তোমার দরকার—

মোমবাতি, সরষের তেলে ডুবানো একটা ভালো পলতে, মোটা মোমবাতির আকারের একটি খোসা ছাড়ানো কলা।



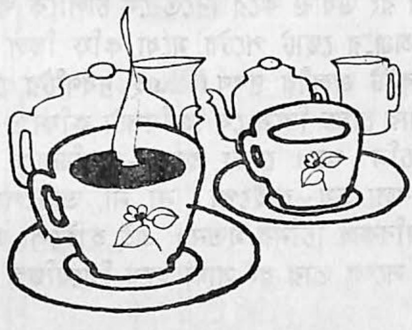
কায়দা করে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে সবটা মুখের মধ্যে চালান করে দিলে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে।

মোমবাতিটাকে ছোট করে কেটে নিয়ে ভালো করে বসাও। তারপর খোসা ছাড়ানো কলাটাকে মোমবাতির সাইজে ঠিক করে কেটে নাও যাতে সবটা মুখের মধ্যে পুরে দিতে পারো। এবার কলাটাকে মোম-বাতির সঙ্গে জুড়ে দাও। কলার ঠিক উপরে পলতেটা জুড়ে দিয়ে একটা দেশলাই জেবলে ওটায় আগুন ধরিয়ে দাও। পলতের মধ্যে প্রচুর তেল থাকায় সেটা বেশ কয়েক মিনিট ধরে জবলতে থাকবে। এরপর তুমি কায়দা করে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে সবটা মুখের মধ্যে চালান করে দিলে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে।

কফির রং গেল কোথায় ?

আমার বাবা তখন চাকরি করতেন আন্দামানে। আমি আর অঞ্জু কোলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতাম, আর গরমের ছুটিতে প্রত্যেকবার জাহাজে চড়ে আন্দামানে যেতাম। শৈলেন কাকু আমাদের তুলে দিতেন জাহাজে, আর পোর্ট থেকে বাবা এসে আমাদের নিয়ে যেতেন।

সেদিন সকালবেলায় আমরা দুজনে জাহাজের ডেকে বসে আছি। সমুদ্র বেশ শান্ত, নীল সাগরের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটো ক্লান্ত হয়ে এসেছে, আজকেই জাহাজ পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছুবে। আমার হাতে রয়েছে সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান ম্যাগাজিন, অঞ্জু এ সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে এমন সময় আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ বেকার। মিঃ বেকারের সঙ্গে আমাদের আগে থেকেই পরিচয় ছিল, তিনি বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ক্যাপ্টেন একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে বললেন—ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে নাকি ?



অঞ্জু উত্তর দিল, না—অর্ডার দেওয়া হয়েছে, বোধ হয় এখুনি এসে যাবে। তারপর আবার ভদ্রতা করে ওঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাদের সাথে এক কাপ কফি খাবেন ?

মিঃ বেকার হেসে উত্তর দিলেন—বেশ তো, আপত্তি নেই।

বেয়ারা এসে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। অঞ্জু আমাদের কেবিন থেকে দুটো কফির পট নিয়ে এল। বড় কফির পট থেকে কফি ঢেলে ক্যাপ্টেনকে দেওয়া হলো। আর ছোট কফির পট থেকে কফি ঢেলে নিজে নিল। আমি কফি খাই না—আমার জন্যে আগেই চায়ের ব্যবস্থা ছিল।

অঞ্জু মিঃ বেকারকে বলল—আমার এই কফিটা খুবই রহস্যজনক, এর মধ্যে চিনি দেওয়ার সাথে সাথে এর রং সাদা হয়ে যাবে, যদি আপনি দেখতে চান তবে আপনাকে তা দেখাতে পারি।

ক্যাপ্টেন খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ম্যাজিক দেখাচ্ছ। আমি এসব দেখতে খুব ভালোবাসি।

অঞ্জু চামচে করে এক চামচ চিনি তার কফিতে দেওয়া মাত্র সমস্ত কফির রং একেবারে সাদা হয়ে গেল।

মিঃ বেকার খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বললেন—তোমার কফির রং চিনি দেওয়ার সাথে সাথে পাল্টে গেল, কিন্তু আমার কফিতে কিছু হলো না কেন?

অঞ্জু বলল—এটা খুবই মজার ব্যাপার। আমি খুশীমতো চিনি দিয়ে যে কোনও কফির রং পাল্টে দিতে পারি। এই ভেল্‌কি বাজী আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন শিলং-এর ডঃ পাকড়াশী। আমি তখন খুবই ছোট।

ক্যাপ্টেন খুব খুশী হয়ে অঞ্জুকে একটা সেফার্স ফাউণ্টেন পেন উপহার দিয়েছিলেন, ওটা এখনও অঞ্জুর কাছে আছে।

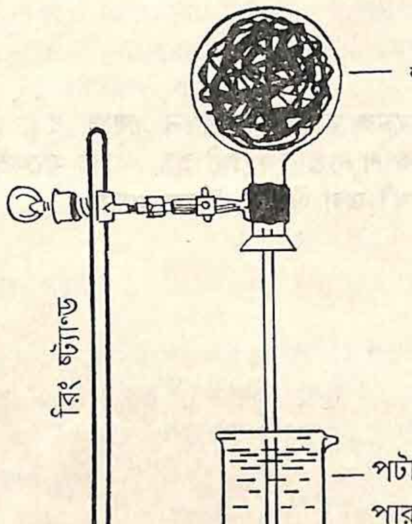
অঞ্জু কফির রং উধাও করে দিতে যে চালাকি খাটিয়েছিল সেটা এখন বলছি। অঞ্জুর ছোট পটের মধ্যে কফি ছিল না, তাতে ছিল আয়োডিনের একটি জলীয় দ্রবণ। এই দ্রবণটির চেহারা অবিকল কফির মতন। আর চামচ দিয়ে যে জিনিসটা কফিতে গোলা হয়েছিল সেটা আদৌ চিনি নয়। সেটা হচ্ছে—সোডিয়াম থায়োসালফেট, সংক্ষেপে যাকে বলা হয়—হাইপো। না, না, ভাইপো নয়—হাইপো। এটাও দেখতে অবিকল চিনির মতন। এই হাইপো আয়োডিন দ্রবণে মেশানোর সঙ্গে সঙ্গে তার রং সাদা হয়ে গিয়েছিল।

কেন এমন হয়?

আয়োডিনের জলীয় দ্রবণ হাইপোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে টেট্রা থায়োনেট নামে একটি যৌগিক রাসায়নিক বস্তু উৎপন্ন করে। এর ফলেই আয়োডিনের রং সাদা হয়ে যায়।

জল তো সব সময় নীচের দিকেই নামে—তাই না? কিন্তু এই মজার খেলায় আমরা গোলাপী জলকে উপরে উঠতে দেখবো আর সাথে সাথে ফ্লাস্কের ভিতরের ষ্টীল উলে মরচে ধরে যাবে। এই সুন্দর ভেল্‌কি বাজীটা দেখাতে অবশ্য তোমার বেশ কতকগুলো জিনিস দরকার হবে। এগুলো হচ্ছে—

ষ্টীল উল; এক লিটার ফ্লাস্ক; ফ্লাস্কের মুখের রবারের ছিপি; ছিপিটাকে ফুটো করে নিয়ে তার মধ্যে তিন ফুট লম্বা একটা কাচের টিউব পরাতে হবে; পারম্যাঙগানেটের জলীয় দ্রবণ, লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড।



পারম্যাঙগানেটের গোলাপী জল কাচের নল দিয়ে
ফ্লাস্কের উপরে উঠতে থাকবে।

এক লিটার ফ্লাস্কের মধ্যে ধরে এমন আয়তনের ষ্টীল উল নাও। এবার লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড তার উপর ঢেলে ষ্টীল উল-গুলোকে জলে ধোও। এই ভিজে উলকে এখন ফ্লাস্কের মধ্যে পুরতে হবে। ছিপি সমেত তিন ফুট লম্বা কাচের টিউবটা ফ্লাস্কের মুখে (ছবিতে যেমন করে দেখানো হয়েছে সেইভাবে) আটকে দাও। একটা রিং স্ট্যাণ্ডের সাথে ফ্লাস্কটাকে উল্টোমুখ করে আটকে দিতে হবে। রিং স্ট্যাণ্ডের তলায় থাকবে বীকারে পারম্যাঙগানেটের জলীয় দ্রবণ। তিন ফুট কাচের নলটা বীকারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত থাকবে। মিনিট দশেক বাদে পারম্যাঙগানেটের গোলাপী জল কাচের নল দিয়ে ফ্লাস্কের উপরে উঠতে থাকবে আর পরিষ্কার উলে মরচে রং ধরে যাবে। ষ্টীল উলকে এ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার সাথে সাথেই এ খেলা দেখানো দরকার। ষ্টীল উল পরিষ্কার হওয়ার পরেই খুব ভালো ভাবে জারিত হতে পারে।

কেন এমন হয়?

ষ্টীল উলের আয়রনের সাথে অক্সিজেন যোগ হওয়ার ফলে ফ্লাস্কের ভিতর আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তার ফলেই নীচের পারম্যাঙগানেটের গোলাপী জল উপরে উঠতে থাকে।

একটা বড় টেষ্ট টিউবের এক চতুর্থাংশ ভর্তি করা হয়েছে অনেকটা নুনের মতো দেখতে সাদা গুঁড়ো দিয়ে। এই সাদা গুঁড়োকে বার্নারের সাহায্যে প্রচণ্ড তাপে গলানো হলো। এইবার দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে দাও। বার্নার নিভিয়ে দিয়ে ঐ গলে যাওয়া সাদা গুঁড়োর ভিতর কিছু শুকনো কাঠকয়লার গুঁড়ো (চারকোল) ছড়াও। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরটা উজ্জ্বল গোলাপী-যুক্ত লাল আভায় ভরে উঠবে। আর কার্বনের কণাগুলো ঐ গলে যাওয়া সাদা গুঁড়োর উপরে এক ধরনের শব্দ করে নাচতে থাকবে।

এই খেলা দেখাতে আমাদের চাই—

পঁচিশ গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট; চারকোল, ২০০ সিসি পাইরেক্স অথবা কর্নিং কাচের মোটা টেষ্ট টিউব, ছোট একটা চামচ, মীকার বার্নার, টেষ্ট টিউব হোল্ডার।

পটাসিয়াম নাইট্রেট থেকে উঁচু তাপমাত্রায় অক্সিজেন বেরোতে থাকে। এই অক্সিজেন চারকোলের সাথে বিক্রিয়া করার সময় সামান্য শব্দও হতে পারে।

কেন এমন হয়?

ঐ সাদা নুনের মতো গুঁড়ো জিনিসটার নাম পটাসিয়াম নাইট্রেট। এর থেকে উচ্চ তাপে অক্সিজেন বেরোয়। এই অক্সিজেন কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করে। উজ্জ্বল গোলাপীযুক্ত লাল আভা হয় পটাসিয়াম ধাতু থাকার জন্য।

নীল আলোর মজা

আজ ডিংকুর জন্মদিন। সারাদিন বাড়ীতে হৈ-চৈ হচ্ছে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর অঞ্জুকে সবাই চেপে ধরল কিছু মজার ভেল্‌কি দেখাতে হবে। অঞ্জুও আজকাল নানা জায়গায় হরেক রকম ভেল্‌কি বাজী দেখিয়ে বেশ হাত পাকিয়ে ফেলেছে। সব সময়েই ওর কোটের পকেটে কিছু না কিছু ম্যাজিকের সাজসরঞ্জাম থাকে।

অঞ্জু পকেট থেকে খেলা দেখানোর জন্যে বের করল—একটা নীল বাল্ব, হোল্ডার (ছবিতে দেখানো হয়েছে), আর বাড়ীর ভেতর থেকে নিয়ে এল একটা ড্রাই ব্যাটারী সেল, দুটো পাঁচশো সিঁসি বীকার, দশ গ্রাম গুঁড়ো নুন আর দশ গ্রাম গ্লুকোজ।

এরপর ব্যাটারীর একটা মুখের সাথে হোল্ডারের কানেকসন করা হলো। ব্যাটারীর অন্য মুখের সাথে হোল্ডারের সরাসরি কানেকসন না করে প্রত্যেকটার সঙ্গে আলাদা তার আটকালো অঞ্জু। প্রথম বীকারে গ্লুকোজ আর দ্বিতীয়টায় নুন দিয়ে তার মধ্যে জল ঢালা হলো। নুন আর গ্লুকোজে জল ঢালার আগে অঞ্জু দু' একজনকে ডেকে গ্লুকোজ একটু করে খেতে দিয়েছিল। গুঁড়ো নুন আর গ্লুকোজ প্রায় একই রকম দেখতে। আর একটা বীকারে যে নুন আছে সেটা সে কাউকে জানতে দিল না।

অঞ্জু বলল, আমি হোল্ডার আর ব্যাটারীর তার দুটো যদি এক নম্বর বীকারে ডুবাই তবে বাল্বের নীল আলো জ্বলবে না। কিন্তু যদি আপনারা হাততালি দেন আর আমি তার দুটোকে এক নম্বর বীকার থেকে তুলে নিয়ে দু' নম্বর বীকারে ডুবাই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নীল আলো জ্বলে উঠবে। আর কি মজা, ওরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠল, অঞ্জু তার দুটোকে দু' নম্বর বীকারে ডুবানোর সঙ্গে সঙ্গে নীল আলো জ্বলে উঠল।

বাল্বের আলো যখন জ্বলছে তখন অঞ্জু একটা ছোট চামচ দিয়ে দু' নম্বর বীকারের দ্রবণের কিছুটা অংশ তুলে নিয়ে দর্শকদের কাউকে খেতে দিল। গ্লুকোজের মিষ্টি জল কি করে নোনতা হলো ভেবে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

কেন এমন হয়?

নুন-জল খুব তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে কিন্তু গ্লুকোজ-জল তা পারে না। তাই নুন-জলের বৈদ্যুতিক আবর্তনীতে নীল বাল্ব সুন্দর ভাবে জ্বলে ওঠে।



অঞ্জু হোল্ডার আর ব্যাটারীর তার দুটো লবণ-জলের ভেতর ডুবানোর সাথে সাথে সুন্দর ভাবে নীল বাল্ব জ্বলে উঠল।

তোমরা রামায়ণ-মহাভারতে মুনি-ঋষিদের গল্প শুনেছ তো? রেগে গেলে তো আর তাঁদের জ্ঞান থাকতো না, যাকে-তাকে যখন-তখন শাপ দিয়ে ভস্ম করে দিতেন। খুশীমতো যেখানে সেখানে আগুন লাগিয়ে দিতেও তাঁরা পারতেন। আমাদের এই যাদুকাঠির খেলাটি আগেকার মুনি-ঋষিদের কথা মনে করিয়ে দেবে। এই ম্যাজিকটি খুব ছোট্ট অথচ সুন্দর খেলা। একটা মোমবাতির পলতেয় তুমি একটা কাঠি ছোঁয়ানোর সাথে সাথে সেটা জ্বলে উঠবে। এজন্য তোমার দেশলাই বা ঐ ধরনের কোনও বস্তুর দরকার হবে না। খুব মজার ব্যাপার নয় কি এটা? এই ভেল্‌কি বাজীটা দেখাতে তোমার



কাচের রডের একদিক ঘন সালফিউরিক এ্যাসিডে ডুবিয়ে
সেটা মোমবাতির পলতেয় ছোঁয়াতেই ওটা জ্বলে উঠল।

চাই—সমপরিমাণ চিনি ও পটাসিয়াম ক্লোরেট, একটি বড় মোমবাতি —যার পলতেটা বেশ ফুলো ও নরম, একটি দু' ফুট লম্বা কাচের রড, ঘন সালফিউরিক এ্যাসিড।

প্রথমে একটা খল-ন্ড়ির (মর্টর) সাহায্যে চিনি ও পটাসিয়াম ক্লোরেটকে আলাদা আলাদা ভাবে বেশ ভালো করে গ্ঁড়ো করো। তারপর দ্টোকে মেশাও। সাবধান, চিনি ও পটাসিয়াম ক্লোরেটকে একসাথে মিশিয়ে গ্ঁড়ো করতে যেও না—তাতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

এবার মোমবাতির পলতেটাতে চিনি ও পটাসিয়াম ক্লোরেটের মিশ্রণ বেশ ভালো করে লাগাও। কাচের রডের একদিক ঘন সালফিউরিক এ্যাসিডে ডুবিয়ে সেটা মোমবাতির পলতেয় ছোঁয়াতেই মোমবাতিটা জ্বলে উঠবে। আমরা সবাই জানি আলো থেকেই আলো জ্বলে। কিন্তু কোথাও কিছ্ নেই, হঠাৎ একটা যাদ্-কাঠি মোমবাতিতে ছোঁয়াতেই আগ্ন ধরে গেল দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

কেন এমন হয় ?

পটাসিয়াম ক্লোরেটের উপস্থিতির ফলে চিনিতে তাড়াতাড়ি আগ্ন ধরে গেল।

আমার বেশ মনে পড়ে, তখন অঞ্জুর বয়স কত আর হবে, বোধহয় সাত কি আট, রং দোলের সময় ওকে প্যাকেট ভর্তি কিনে দিতে হতো লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রং। একবার মনে আছে, ছোটকাকুর সাদা পাঞ্জাবিতে ভ্যানিসিং রং দিয়ে সে আলমারীর পিছনে চুপটি করে লুকিয়ে ছিল। ছোটকাকুর সে কি রাগ—আবার কয়েক মিনিট বাদেই যখন রংটা উধাও হয়ে গেল, তখন অঞ্জু ছোটকাকুর সামনে এসে হো হো করে হেসে ডিগবাজি খেয়েছিল। সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। এখন অঞ্জু তো আর ছোট নেই—কতো বড় হয়েছে সে, কলেজে থার্ড ইয়ারে কেমিষ্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়ে। কলেজের রি-ইউনিয়নের উৎসবে সে একটা মজার ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। এখানে সেই খেলাটির কথা তোমাদের বলছি। এটা খুব সুন্দর অথচ ছোট্ট খেলা। রংয়ের এই ভেল্‌কি বাজীটা দেখাতে আমাদের চাই—

পাঁচশো সিসি এ্যালকোহল গোলা তিন গ্রাম কোবালটাস ক্লোরাইড।



রংটা প্রথমে হবে গোলাপী, তারপর আস্তে আস্তে নীল,
আবার পরে গোলাপী রং হয়ে বারে বারে পাল্টাবে।

অঞ্জু কি করে এই খেলাটা দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল—সেটা এবার শোন।

একটা বড় বীকারে পাঁচশো সিসি এ্যালকোহল নিয়ে তার মধ্যে তিন গ্রাম কোবালটাস ক্লোরাইড গোল। এ্যালকোহলের রং-টা গোলাপী হয়ে যাবে। তারপর আস্তে আস্তে নীল হবে, পরে আবার গোলাপী হবে। এইভাবে বারে বারে রং বদলাতে থাকবে।

বীকারটাকে একটা হট প্লেটের উপর রাখতে হবে। হট প্লেটের ব্যবস্থা না থাকলে একটা হিটারের উপর এ্যাসবেসটস বোর্ড দিয়ে তার উপরেও বীকারটাকে রাখতে পারো। সুইচ টিপলে এ্যালকোহল গরম হবে আর সাথে সাথে গোলাপী রং নীল হয়ে যাবে। আবার সুইচ নিভিয়ে দিলে এ্যালকোহল ঠাণ্ডা হবে আর নীল রং গোলাপী হয়ে যাবে। বীকারের পিছনে যেন একটা বড় পাওয়ারের আলো থাকে। তাহলে রংয়ের এই পরিবর্তন খুব স্পষ্ট করে দেখা যাবে।

কোবালটাস ক্লোরাইড এ্যালকোহলে গোলার পর সেটাকে খুব অল্প তাপ দিতে পারো—যাতে দ্রবণের উষ্ণতা সাধারণ তাপমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি হতে পারে। এরপর এ্যালকোহলের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করে জল দাও যতক্ষণ পর্যন্ত তার রং গোলাপী হয়। এই অবস্থায় সাধারণ উষ্ণতার দ্রবণের রং গোলাপী থাকবে।

কেন এমন হয় ?

রং বদলানোর কারণ খুব সম্ভবতঃ কোবাল্ট ক্লোরাইড অণুর সাথে যে জল আটকিয়ে থাকে তার স্থান-পরিবর্তনের জন্য। গরম হলে কোবাল্ট-ক্লোরাইড অণুর আটকানো জল ওই দ্রবণ থেকে বেরিয়ে আসে। এ্যালকোহল সেই জলকে শুষে নেয়। ঠাণ্ডা হলে ওই জল আবার দ্রবণের অণুর সাথে সংযুক্ত হয়। রংয়ের এই পরিবর্তন চলতে থাকবে, যতক্ষণ দ্রবণটিকে ক্রমান্বয়ে ঠাণ্ডা ও গরম করা হবে।

ম্যাজিক কালি

আজ রবিবার। ছুটির দিন বলে সকলেরই খুব মজা। বাবুন, মিঠুন, ডিংকু, বাপ্পা, লবু-কুশু ওরা সবাই অঞ্জুকে ঘিরে ধরেছে কিছু আজব ভেল্‌কি বাজী দেখানোর জন্য। অঞ্জুরও রসায়নের ভেল্‌কি দেখিয়ে এমন হাত পেকে গিয়েছে যে, এখন যে কোনও সময়ে তার কিছু একটা মজার খেলা দেখাতে অসুবিধা হয় না।

অঞ্জু ছোটদের যে খেলাটা দেখিয়েছিল সেটা এখানে বলছি। সে দুটো বীকারের সাদা জলকে মেশাতেই সুন্দর কালি তৈরি হয়ে গেল আর ওরা সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। এই খেলা দেখাবার জন্য অঞ্জু দুটো দ্রবণ তৈরি করেছিল। এগুলি হচ্ছে—

দ্রবণ : 'ক'—আধ গ্রাম পটাসিয়াম আয়োডেট ৩০০ সিসি জলে গোলা;

দ্রবণ : 'খ'—০·২ গ্রাম সোডিয়াম সালফাইট নিয়ে তাতে এক সিসি লঘু সালফিউরিক এ্যাসিড সমেত কয়েক সিসি জল দেওয়া হলো; এর মধ্যে ১৫ সিসি স্থায়ী ষ্টার্চ দ্রবণ মেশানো হলো। এরপর সমস্ত দ্রবণের মধ্যে এমন পরিমাণ জল মেশাতে হবে যাতে তার আয়তন ৩০০ সিসি হয়।

স্থায়ী ষ্টার্চ দ্রবণ এইভাবে তৈরি করা যায়—১০০ সিসি জলে দু' গ্রাম ষ্টার্চ গুলে নিয়ে সেটাকে ফুটাও। তারপর ফিলটার করে নিলেই চলবে।

দ্রবণ 'ক' এবং দ্রবণ 'খ'—দুটোই আলাদা আলাদা বীকারে তৈরী করা দরকার। ক ও খ একসাথে মিশিয়ে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেই সুন্দর কালি তৈরী হবে।

কেন এমন হয় ?

দ্রবণ দুটোকে একসাথে মেশালে আয়োডিন বেরোতে থাকে। ঐ আয়োডিন ষ্টার্চের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাজিক কালি উৎপন্ন করে।

একটা কমলালেবু রংয়ের মজার গাছ তৈরি করতে চাও তুমি? এস, স্ফটিকের মতো সুন্দর এই কেমিক্যাল গাছ একটা বীকারে আমরা তৈরি করি। এটাকে অনেকদিন ধরে রাখাও চলবে। শুধু তাই নয়, মজার এই কেমিক্যাল গাছটা দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। এটা করতে আমাদের চাই—

দু'শো গ্রাম পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট; পাইপ পরিষ্কার করার প্যাকেজ; এক লিটার বীকার।



গাছের গুঁড়িতে এবং ডালপালায় ডাইক্রোমেটের স্ফটিক জমে চমৎকার কমলালেবু রং-এর একটা কেমিক্যাল গাছ তৈরি হয়েছে।

প্রথম দু'শো গ্রাম পটাসিয়াম ড্রাইক্রোমেটের মধ্যে দু'শো সিসি জল ঢেলে একটা কাচের রড দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকো। তারপর

দ্রবণটিকে ফুটিয়ে ডাইক্রোমেটের একটি সংপৃক্ত দ্রবণ তৈরি করো। এবার পাইপ পরিষ্কার করার প্যাকেজগুলি দিয়ে ছোট একটা গাছ তৈরি করতে হবে। ডালপালা তৈরি করার পর উপর থেকে একটা শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে আস্তে গাছটাকে বীকারের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দাও। খুব সাবধানে ডাইক্রোমেটের দ্রবণের মধ্যে গাছটাকে ডুবাতে হবে যাতে বীকারের গায়ে সেটা না লাগে। এই অবস্থায় গাছটাকে দু'-একদিন ঝুলিয়ে রাখতে হবে। গুঁড়িতে এবং ডাল-পালায় ডাইক্রোমেটের স্ফটিক জমে চমৎকার কমলালেবু রংয়ের একটা কেমিক্যাল গাছ তৈরি হবে। এরপর গাছটাকে বীকার থেকে আস্তে করে তুলে ঘরের কোথাও সাজিয়ে রাখতে পার।

কপার সালফেটের (তুঁতে) সংপৃক্ত দ্রবণ তৈরি করেও এই রকম কেমিক্যাল গাছ বানানো যায়।

কেন এমন হয়?

সংপৃক্ত দ্রবণে ডাইক্রোমেট লবণের কমলা রংয়ের স্ফটিকগুলো গাছের গায়ে জমে বড় হয়।

লাল রুমাল, নীল রুমাল

একটা ভিজে সাদা রুমালকে লাল রং অথবা নীল রং করতে পার তোমরা ?—পার না ? আমিও পারতাম না তোমাদের মতো। এই মজার ভেল্‌কি বাজীটা আমায় অঞ্জু শিখিয়ে দিয়েছিল। তুমি প্রথমে ভিজে সাদা রুমালটাকে একটা বীকারের দ্রবণে ডুবাও। রুমালটাকে তুলে নিলে দেখবে—অদ্ভুত কান্ড, সাদা রুমালটা টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে। আর যদি নীল রং করতে চাও তবে রুমালটাকে আর একটা বীকারের দ্রবণের ভিতর ডুবাও। এবার দেখবে লাল রংয়ের বদলে চমৎকার নীল রং হয়েছে। এই খেলাটা দেখাতে হলে তোমার চাই—

কুড়ি গ্রাম ফেরিক ক্লোরাইড, পাঁচ গ্রাম পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট, দশ গ্রাম পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড, তিনটে ৪০০ সিসি বীকার।

ফেরিক ক্লোরাইড, থায়োসায়ানেট এবং ফেরোসায়ানাইডের দ্রবণকে আলাদা আলাদা বীকারে নাও। এবার প্রত্যেকটি বীকারে ১০০ সিসি করে জল দিয়ে বেশ ভাল করে নেড়ে ওদের জলীয় দ্রবণ তৈরি কর।

প্রথমে সাদা রুমালটাকে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণে ভিজিয়ে নিতে হবে। এরপর যখন তুমি সেটা থায়োসায়ানেট দ্রবণে ডুবাবে তখন রুমালের রং হয়ে যাবে টকটকে লাল। আবার ঐ ফেরিক ক্লোরাইড মেশানো সাদা রুমালটি পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড দ্রবণে ডুবালে রুমালটা ঘন নীল রং ধারণ করবে।

রুমালের খেলা দেখানো হয়ে যাওয়ার পর তুমি ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণের কিছুটা থায়োসায়ানেটের মধ্যে ঢালো। তরলের রং টকটকে লাল হয়ে যাবে। আবার যখন অবশিষ্ট ফেরিক ক্লোরাইড ফেরোসায়া-নাইডের মধ্যে দেবে তখন তার রং হবে ঘন নীল।

কেন এমন হয় ?

ফেরিক আয়রন পটাসিয়াম থায়োসায়ানেটের সঙ্গে ক্রিয়া করে রক্তের মতো লাল রং তৈরি করে আর ফেরোসায়ানাইডের সঙ্গে ক্রিয়া করে ঘন নীল রং উৎপন্ন করে। এই খেলাটি খুব সুন্দর এবং সাথে সাথে এর সাহায্যে ফেরিক আয়রনের উপস্থিতিও ধরা পড়ে।

কৃত্রিম সোনা

রসায়নের ভেল্কি বাজী দেখিয়ে কত কি যে করা যায় তার শেষ নেই। মাত্র তিনটে কেমিক্যাল তোমার হাতের কাছে থাকলে তুমি কৃত্রিম সোনার খেলা দেখিয়ে সবার চোখ ছানাবড়া করে দিতে পারো। তোমার টেবিলের উপর থাকবে শুধু দুটো বীকার। আর এই বীকারে রাখা আছে টলটলে জলের মতো পরিষ্কার দুটো তরল পদার্থ। তুমি একটা বীকারের তরল বস্তু অন্য আর একটা বীকারে ঢেলে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করো। দেখবে চমৎকার গাঢ় সোনালী রংয়ের কৃত্রিম সোনা তৈরী হয়েছে। বীকারে তরল পদার্থটা ঢালার সময় তুমি হয়তো একটা মজার গল্প ফেঁদে বসলে। তাতে দর্শকরা আনন্দ পাবে আরও বেশি। এটা দেখাতে হলে আমাদের চাই—

দুটো দ্রবণ—ক আর খ। দ্রবণ-ক তৈরী হবে একটা বীকারে এক গ্রাম সোডিয়াম আরসেনাইট পঞ্চাশ সিসি জলে গুলে। তার মধ্যে ৫·৫ সিসি গ্লেসিয়াল এ্যাসেটিক এ্যাসিডও ঢালতে হবে। দ্রবণ-খ তৈরি করো দশ গ্রাম হাইপো পঞ্চাশ সিসি জলে গুলে।

একটা ঘড়ির সাহায্যে তুমি দেখে নাও ঠিক কত সময় লাগছে সোনালী রং তৈরী হতে। দরকার মনে করলে একটা যাদুকাঠিও বীকারের উপর বুলাতে পারো।

কেন এমন হয় ?

এ্যাসিড এবং হাইপোর সাথে ধীরে বিক্রিয়া হওয়ার ফলে সোনালী রং হতে সম্ভবত কিছুটা দেরী হয়। এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বেরোয়। এই গ্যাস সোডিয়াম আরসেনাইটের সাথে ক্রিয়া করে হলুদ রংয়ের আরসেনিয়াস সালফাইডের থিতানি ফেলে।

অঞ্জু বলল—এই পাত্রটা হচ্ছে খুবই রহস্যজনক। শিলং-এ থাকার সময় ডক্টর পাকড়াশী এই পাত্রটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি এই পাত্রের জল আমার টেবিলের উপর রাখা পাঁচটা বীকারের মধ্যে ঢালব। জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি পাত্রে পাঁচ রকমের বিভিন্ন রং তৈরী হবে। আর অবাক কান্ড—অঞ্জু সেই রহস্যজনক পাত্রটা থেকে জল ঢালার সাথে সাথে লাল, সাদা, নীল, কালো ইত্যাদি হরেক রকম রং তৈরী হয়ে গেল।



অঞ্জু সেই রহস্যজনক পাত্র থেকে জল ঢালার সাথে সাথে লাল, সাদা, নীল, কালো ইত্যাদি হরেক রকম রং তৈরী হয়ে গেল।

অঞ্জু কি করে এই খেলাটা দেখিয়েছিল এবারে তা বলছি। সে রহস্যজনক পাত্রটার মধ্যে ৫০০ সিসি জল নিয়ে তার ভিতরে পাঁচ গ্রাম ফেরিক এ্যামোনিয়াম সালফেট গুলেছিলো। আর টেবিলের উপর

এক থেকে পাঁচ নম্বর পাত্রের মধ্যে সে রেখেছিলো খুব অল্প জলে আধ গ্রাম কয়েকটি জিনিস। এরা হচ্ছে—

(১) পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট (২) বেরিয়াম ক্লোরাইড (৩) পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড (৪) ট্যানিক এ্যাসিড (৫) টারটারিক এ্যাসিড।

কেন এমন হয়?

ফেরিক এ্যামোনিয়াম সালফেটের সাথে বীকারে রাখা বিভিন্ন দ্রবণের বিক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের সৃষ্টি হয়। যেমন—

পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট-এর জন্য রং হয় লাল।
বেরিয়াম ক্লোরাইডের জন্য রং হয়—সাদা।
পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের জন্য রং হয়—নীল।
ট্যানিক এ্যাসিডের জন্য রং হয়—কালো।
টারটারিক এ্যাসিডের জন্য রং হয়—সবুজ।

এই ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখাতে হলে তোমাকে প্রথমে একটা এক গ্যালন খালি ভার্নিসের টিনের পাত্র জোগাড় করতে হবে। এর সাথে টিনের মুখের টাইট ফিটিং রবারের ছিপিও থাকা চাই।

প্রথমে টিনের পাত্রটিকে আগুনের উপর ধর। তারপর ওর মধ্যে আধ গ্লাস জল ঢেলে দিয়ে ফুটাতে থাক। যখন জল বেশ টগবগ করে ফুটবে ঠিক তখন আগুনের উপর থেকে পাত্রটা সরিয়ে নিয়ে সংগে সংগে রবারের ছিপিটা ভাল করে এঁটে দাও। এবার টিনের উপর থেকে বরফ জল ঢাললে এক অবাক করা মজার কাণ্ড হবে—সম্পূর্ণ টিনের পাত্রটা একেবারে দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাবে।

এই খেলা দেখাবার সময় একটা জিনিস সব সময় মনে রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে—আগুন থেকে টিনের পাত্রটা সরাবার সাথে সাথেই রবারের ছিপি ভাল করে তার মুখে এঁটে দিতে হবে। যখন টিনের ভিতরের জল ফুটছে আর তার মুখ থেকে বাষ্প বেরিয়ে আসছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভিজে রবারের ছিপি বেশ জোরে আটকে দাও। এখন বরফ-জল ঢাল, দেখবে কেমন চমৎকার টিনের পাত্রটা দুমড়ে গেল।

ঠিক এই ধরনের আর একটা খেলা তুমি দেখাতে পার। একটা পাইরেক্স কাচের ফ্লাস্কে একশো সিসি জল নিয়ে সেটাকে ফুটাও। জল যখন বেশ ফুটছে সেই সময় ফ্লাস্কটাকে আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সংগে সংগে তার মুখটা একটা ভিজে রবারের ছিপি দিয়ে এঁটে দাও। এবার ফ্লাস্ককে বাইরে থেকে বরফ জল দিয়ে ঠাণ্ডা করলে দেখবে, তার ভিতরের জল আরও বেশি টগবগ করে ফুটছে। এই খেলা দেখাবার সময় খুব সাবধান, কেননা এতে ফ্লাস্ক ফেটে যাওয়ার ভয় থাকে। বরফ জল দেওয়ার সময় একটা ছোট্ট তোয়ালে দিয়ে ফ্লাস্কের মুখ জড়িয়ে ধরে রাখতে পার। এই খেলাটা ছোট্ট হলেও খুব আকর্ষণীয়—কারণ জল ঠাণ্ডা করলে আরও বেশি জোরে ফুটতে থাকে।

কেন এমন হয়?

টিনের গায়ে স্টীম জমে সেখানে একটা আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি করে। বাইরের বাতাসের চাপ ও পাত্রের ভিতরের চাপ এক না হওয়ার দরুন ওটা ঠাণ্ডায় আস্তে আস্তে দুমড়ে যায়।

সুন্দরী ঝর্ণা তো কেবল উপর থেকে নিচের দিকেই আসে। কিন্তু এই ভেল্কি বাজীর খেলায় আমরা দেখবো এক মজার ঝর্ণা। এই ঝর্ণা নীচের থেকে উপরে উঠে সকলকে অবাক করে দেবে। এই খেলা দেখাতে আমাদের চাই—

একটা গাল তিন লিটার ফ্লাস্ক; ফ্লাস্কের মুখের রবারের ছিপি—এই ছিপির মাঝখানে একটা ফুটো থাকবে। ঐ ফুটো দিয়ে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা একটা কাচের টিউব (যার এক দিকে খুব সরু একটা জেট তৈরি করা হয়েছে) লাগানো আছে। তিন ফুট লম্বা কাচের টিউব, এর একদিকে আটকানো থাকবে খুব ছোট দু' ইঞ্চি রবার টিউব।

ভূতুড়ে গোলাপী জলের ছবিটা ভাল করে দেখলে কি করে এটা করবে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাবে।

প্রথমে ফ্লাস্কের মধ্যে অল্প জল নিয়ে বেশ ভাল করে ফোটাতে হবে। এইবার রবারের ছিপি দিয়ে (যার ফুটোর মধ্যে একদিকে জেট করা চার ইঞ্চি কাচের টিউবটা ঢুকানো আছে) ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করে তিন ফুট কাচের টিউবটা চার ইঞ্চি লম্বা টিউবের সাথে রবার টিউব দিয়ে আটকে দাও। তারপর লম্বা কাচের টিউব সমেত ফ্লাস্ক-টাকে উল্টো করে একটা জল ভর্তি বীকারের নীচে ডুবাও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বীকারের জল ঐ ফ্লাস্কের সরু জেটের ভিতর দিয়ে বেশ জোরে শব্দ করে ঝর্ণার মতো পড়তে থাকবে। নীচু থেকে উঁচুতে জল উঠতে দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে।

এই খেলা দেখাবার সময় দুটো জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখবে। (এক) চার ইঞ্চি লম্বা টিউবের জেট, যেটার মুখ ফ্লাস্কের ভিতর দিকে থাকবে সেটা যত সরু হবে ততই ভাল। (দুই) ফ্লাস্ককে উল্টে নেওয়ার আগে দেখে নেওয়া দরকার যে খুব অল্প পরিমাণ জল তার ভিতরে ফুটছে আর ঐ লম্বা কাচের নল দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে আসছে। ঠিক এই সময়েই পরের কাজগুলো করতে হবে।

কেন এমন হয়?

ফ্লাস্কের ভিতরে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য নীচের বীকারের জল তীব্র গতিতে কাচের নল দিয়ে গিয়ে উপরে পড়ে।

এস, এবার আমরা রং বেরং-এর মজার ম্যাজিক ছবি আঁকব।

টেবিলের উপর একটা শক্ত কার্ডবোর্ড রয়েছে। তুমি তুলি দিয়ে জলের মতো দেখতে তিনটে বর্ণহীন দ্রবণের সাহায্যে ওই কার্ডবোর্ডে যে কোনও একটা ছবি আঁক। বর্ণহীন দ্রবণ দিয়ে ছবি আঁকলেও দেখতে পাবে ছবির রং হয়েছে যথাক্রমে—লাল, নীল ও কালো। কেন এমন হলো বল তো?

কার্ডবোর্ডের উপর আগে থেকেই ঘষা ছিল শুকনো ফেরিক ক্লোরাইড লবণ। আর, জলের মতো বর্ণহীন দ্রবণগুলো ছিল—পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট, পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ও ট্যানিক এ্যাসিড। ছবি আঁকার সময় প্রত্যেকটা দ্রবণের জন্য আলাদা আলাদা তুলি ব্যবহার করতে হবে।

আরও একটা মজার ছবি তুমি আঁকতে চাও? তাহলে একটা খসখসে সাদা পুরু কাগজের উপর একটা তুলি জলে ডুবিয়ে আঁক। ছবিটা একেবারে কালো রংয়ের হয়ে যাবে। এটা করতে হলে আগে থেকে ঐ সাদা খসখসে কাগজটাকে সমপরিমাণ শুকনো ট্যানিক এ্যাসিড আর ফেরিক এ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে ঘষে নিতে হবে। এরপর তুলিটা জলে বুলিয়ে ঐ কাগজের উপর কিছু আঁকলেই সেটা কালো হয়ে যাবে।

ছবির রং টকটকে লাল করতে চাও তুমি? তাহলে কিন্তু আগে থেকে তোমাকে ঐ সাদা কাগজের উপর সমপরিমাণ সোডিয়াম স্যালিসাইলেট ও ফেরিক এ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে ঘষে নিতে হবে। এরপর জলের ভিতর তুলি ডুবিয়ে ঐ কাগজে কোনও ছবি আঁকলেই সেটা টকটকে লাল রঙের হয়ে যাবে।

ঘরের মধ্যে হাঁটবার সময় একজন ভদ্রলোকের পা গিয়ে একটা ছোট্ট কাগজের উপর পড়তেই, দুম্ করে জোর একটা শব্দ হলো, ভদ্রলোক বেশ খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। এই দুম্-পটাস খেলাটা বেশ মজার, নয় কি?

কাগজটাকে পায়ের নীচে না ফেলে যদি তুমি এক মিটার লম্বা একটা লাঠি ঐ কাগজে ছোঁয়াও তাহলেও শব্দ হবে—অবশ্য ঠিক আগের মতো অতটা জোরে নয়।

এই মজার খেলাটা দেখাতে হলে আমাদের চাই—

পাঁচ গ্রাম আয়োডিন; তিন গ্রাম পটাসিয়াম আয়োডাইড, কুড়ি সিসি ঘন এ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ফিলটার কাগজ, একটা ফানেল।

একটা বীকারের মধ্যে পটাসিয়াম আয়োডাইড ও আয়োডিন নিয়ে তার ভেতর পঞ্চাশ সিসি জল ঢাল। তারপর খুব আস্তে আস্তে এ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ঢালতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত থিতানি পড়ে। এইবার ঐ ফানেলের সাহায্যে খুব সাবধানে ফিলটার কর। ফিলটার করার সঙ্গে সঙ্গে ফিলটার কাগজের উপর ঐ ভিজে অধঃক্ষেপকে আরও চার-পাঁচটা ফিলটার কাগজে পাতলা করে লেপে সরিয়ে দাও। তারপর ফিলটার কাগজগুলোকে অনেকগুলো ছোট ছোট টুকরো করে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে শুকোতে দাও। এখানে তোমাকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোনও অবস্থাতেই যেন ফিলটার কাগজের উপর শুকনো অধঃক্ষেপের পুরু স্তর জমতে না পারে।

কেন এমন হয়?

অধঃক্ষেপটি হচ্ছে নাইট্রোজেন-ট্রাই-আয়োডাইড। এটা শুকনো অবস্থাতে সামান্য ছোঁয়াতেই বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। ভিজে থাকলে অবশ্য হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয় না।

—

ভেল্‌কি বা ভোজবাজি জিনিসটা কি?—এমন কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা বা ব্যাপার, যা চোখের সামনে হতে দেখছি বা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কেমন করে তা হচ্ছে বুঝতে পারছি না—আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই যার ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছি না। রসায়নশাস্ত্রে এরকম বিস্ময়কর ব্যাপারের উদাহরণ প্রচুর, সাধারণ বুদ্ধিতে যেগুলি কি করে ঘটছে কিছুতেই বোঝা যায় না; ফলে, দারুণ অবাক লাগে—মনে হয় বুঝি ম্যাজিক দেখছি। এমন গোটা চল্লিশেক সচিত্র ম্যাজিক পার্থসারথি চক্রবর্তী এর আগে 'কেমিক্যাল ম্যাজিক'-এ উপহার দিয়েছিলেন ছোটদের। যেগুলি পড়তে যত মজা, তার চেয়ে অনেক বেশী মজা করে দেখায় এবং অন্যকে দেখানোয়।

এবার সেরকম আরও প্রায় ত্রিশটি নতুন ম্যাজিক তিনি হাজির করেছেন এই 'রসায়নের ভেল্‌কি'তে। এগুলি 'কেমিক্যাল ম্যাজিক'-এর ম্যাজিকগুলির চেয়েও আরও অনেক আকর্ষক এবং উত্তেজনাপ্রদ। এগুলিও সচিত্র। 'রসায়নের ভেল্‌কি'কে অনায়াসেই 'কেমিক্যাল ম্যাজিক'-এর দ্বিতীয় খণ্ড বলা যায়।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের রহস্যের প্রতি কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করার মত সুলিখিত বই এমনিতেই বাংলায় খুবই দুর্লভ। 'কেমিক্যাল ম্যাজিক' এবং 'রসায়নের ভেল্‌কি' কিন্তু সেইরকম দুর্লভ দু'খানি বই।